Bong Srijani
Let Bong spread its Aura

বং সৃজনী শারদীয়া

Srijani
Adds Colors to Life

Today's buzz in the fashion industry.....Srijani is flying from India to USA, UAE, Europe with Indian, Indo western apparels, accessories and home decors.

Contact us with the code: Srijani15 to avail the discount of 15% on selected products.

Contact: +91 97480 58563/+32499947994
Email: contact@srijanicorp.com

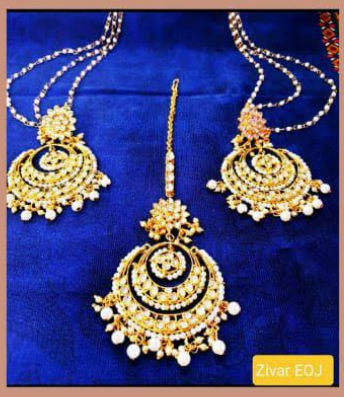

ZIVAR EMPIRE OF JEWELS

OUR START

What started as a deep passion 2 years ago , turned to gifting these pieces to near and dear ones. Now we feel very proud to bring this piece of joy to your doorstep with a click of a mouse or a phone call.

At ZivarEOJ we are committed to deliver the most suitable customized handcrafted jewelry to match perfectly with your outfit

COLLECTION

NECKLACES
PENDANTS

BRACELETS
EARRINGS

NECKLACE-EARRINGS SETS

Contact us @

Shop Online:www.zivareoj.com
FB: @zivarhandcraftedjewellery
WhatsApp : +91 9533042909
E-mail us : info@zivareoj.com

BANCHBO

SOCIOCULTURAL ASSOCIATION

Organization You can Trust..

NGO DARPAN GOI ENLISTED, 80G CERTIFIED AND SOCIETY REGISTERED NGO

FCRA REGISTERED

In the EDUCATION OF CHILDHOOD, in the way of establishing youth, in the CARE OF OLD AGE...
BANCHBO is with everyone for more than two DECADES SINCE 1995
Many INTERNATIONAL and NATIONAL CREDENTIALS...

Kolkata | Sundarban | Jungle Mahal

OUR KEY ACTIVITIES:

Pre primary and Primary School for marginalized kids at Sundarban - **VIKASHITA**

Comprehensive Eastern India's First 24 x 7 Home based Elder Healthcare Support - **BANCHBO HEALING TOUCH**

Skill training for youth of Kolkata, Sundarban and Jungle Mahal - **BANCHBO SCHOOL OF HUMAN SKILL DEVELOPMENT**

CULTURAL INITIATIVE with Global connection

Educational and Skill Scholarship for Sundarban and Jungle Mahal - **'BARIYE DAO TOMAR HAAT'**

EXCLUSIVE GERIATRIC OPD AT SUNDARBAN AND HEALTH CAMPS AND AWARENESS INITIATIVES

RELIEF WORKS IN NATURAL DISASTERS IN SUNDARBAN

To know more about us -
Website: www.banchbongo.org
www.banchbohealingtouch.org
Facebook Page: www.facebook.com/BANCHBO

Contact : 9331036206 / 9007012491
9007012490 / 9831077725 / 9831612711

Our Bank details are as follows -
A/c Name : Banchbo Socio Cultural Association
A/c No. : **0143010277924**
Bank : United Bank of India Branch : Garia
IFSC Code : **UTBIOGRA144**

A/c Name : Banchbo Socio Cultural Association
A/c No. : **232010100077552**
Bank : Axis Bank Branch : Garia
IFSC Code : **UTIB0000232**

সূচিপত্র

বং সৃজনীর শারদ সংখ্যার প্রস্তাবনা

পুজো পরিক্রমা

কলকাতার দুর্গাপুজো আদি কথা ৩
বঙ্গদেশে দূর্গা পূজার ইতিবৃত ৫
শারদীয়ার উষ্ণ আবেগ ৬

আমার পূজা

দুর্গাপূজা: স্মৃতির মনিকোঠা থেকে ৯
আমার পূজা-বেলা ১০

উমা যখন বিদেশে

এক রাজার দেশে মহামায়ার আবির্ভাব ১৬
হল্যান্ডের পূজা ১৯
আনন্দধারা ১৯
শারদ সম্প্রীতি ২০

কলমে খুন্তিতে

বাবর - ই - হান্ডি ৩৪
কুমড়ো চিংড়ি ৩৫
কমলা ভোগ ৩৫
সফেদ মুর্গ্ ৩৬

বঙ্গ সংস্কৃতি

বং সৃজনী ফ্যাশন বিভাগ ৩৯
নৃত্যাঙ্গন ৪০
প্রগতি বাংলা ৪১

গল্পে কথায়

মালতি ১১
যখন ভাঙল অভিমান ১২
পেয়িং গেস্ট ২৭
মিডিয়ানামা ৩০
পত্রমিতা ৪৫
ছেঁড়া মানি ব্যাগ ৪৬
কোথায় চলেছি ৪৭
একটি মেয়ের কথা ৫১
স্মৃতি মধু সম ৫৪

খেলার জগৎ ৪২
চলচ্চিত্র জগৎ ৫৩
ধাঁধা ৫৯

পূর্নাশা দাস, ভারত

ছন্দে ছন্দে

এবারের পুজো ৭
আমন্ত্রণ ৭
অভিশপ্ত প্রাণ ৮
বাকি কথা'রা ৮
ঢেকে রাখো ৮
ভালোবাসা একটি প্রজাপতির নাম ৮
একটি চিরন্তন প্রেমের আলেখ্য ২৫
প্রেম ২৬
নিষিদ্ধ চৌকাঠ ২৬
মনের কথা ২৬
মেঘালয় থেকে ২৬
হাওয়ার নুপূর ৪৩
বসে আছি ৪৩
বন্যা ৪৩
ধূসর প্রেম ৪৩
হৃদয় ৪৪
ভদ্রলোক ৪৪
হৃদয়ের রং ৪৪
রাজা আর ভাইরাস ৪৪
মশার ধোঁকাবাজি ৫১
সাধ ৫১
নতুন প্রেম ৫২
অর্জন ৫২
বেঁচে থাকার গান ৫৭
চালাও পানসি মাঝদরিয়া ৫৭

চলো যাই

প্রথম হিমালয়-ফিরে দেখা ১৩
গন্তব্য ছিল অস্ট্রিয়া ৩২

শৈশবের আঁকিবুঁকি ২১
আজকের দূর্গা, আমি দূর্গা ২৪
একটু জল পাই কোথায়, বলতে পারেন? ৪৯
মানুষ ৫৬
বাঁচবো' - ভরসার এক নাম ৫৮

বং সৃজনীর শারদ সংখ্যার প্রস্তাবনা

সাত সাগর আর তেরো নদীর পাড়ে বসে যে সমস্ত বাঙালিরা বাংলার সংস্কৃতির জন্য প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন, আমি তাদের সকলকে জানাই প্রাণভরা শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। যখন শবরী একটি মহত্তম শারদোৎসব প্রয়াসের কথা আমায় জানিয়েছিল, বিশ্বাস করুন, আমার মনে আকাশে হাজার খুশির আলো জ্বলে উঠেছিল। আমি জানি বিশ্ব বাংলার বিরাট প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষা চর্চা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। আপনারা যেভাবে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপক্রম করে বং সৃজনীর শারদ সংখ্যা প্রকাশের স্বপ্নকে সফল করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে আমি দুর্গাপুর, ভারতবর্ষ থেকে ডক্টর তানিয়া চক্রবর্তী, সুইজারল্যান্ডে থেকে অমৃতা রায়, বেলজিয়ামে থেকে সায়নী দে ভট্টাচার্য এবং সুমনা দে মল্লিক, মাস্কাট থেকে সমিতা চক্রবর্তীর কথা বলবো।

পৃথ্বীরাজ সেন

যদিও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে পৃথিবী এক ভুবন গ্রামে পরিণত হয়েছে, এক লহমায় আলাস্কা থেকে আন্টার্টিকায় পৌঁছে যাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও এমন একটি শারোদৎসব স্বপ্নকে সফল করতে হলে যে কত কষ্ট, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার স্বীকার করতে হয় তা অতি সহজেই অনুমেয়। সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আপনারা এক মহত্তম কাজ করে আমাদের সকলকে এক আনন্দ সাগরে অবগাহন করার সুযোগ দিয়েছেন।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে নেদারল্যান্ডে মনিকা চক্রবর্তী এবং বেলজিয়ামের ভিক্টর মিত্রকে। তারা না থাকলে এত সহজে এবং এত সুন্দর ভাবে ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

এক বছর বাদে মা দুর্গা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসছেন। আমি জানি বিশ্ববাংলার সমস্ত বাঙালি পুজোর ক'দিন সাধ্যমত দেবী বন্দনা আয়োজন করে থাকেন। নাইবা সেখানে দেখা গেল কাশের যৌবন, অভিমানী শিউলির ঝরে পড়া, কিন্তু প্রাণের আনন্দে এতোটুকু ঘাটতি হবে না।

এই সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীর প্রধান হিসেবে আমি প্রার্থনা করি আগামী দিনে বং সৃজনী যেন সত্যি সত্যি বিশ্ব বাংলার সার্থক মুখপাত্র হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর এখানে সেখানে অন্য কোনোখানে যাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, তাঁদের জীবনের সর্বসেরা শারোদৎসব নিদর্শনগুলি এই পত্রিকার পাতায় পাতায় প্রকাশিত হয় আমাদের হৃদয়স্পর্শ করবে। আপনাদের চলার পথে হাজার গোলাপ ফুলোস্রুস্নাত অভিবাদন ঝরে পড়ুক। সকলকে আরো একবার অনেক ভালোবাসা জানিয়ে, আপনাদের সকলের কাছের মানুষ পৃথ্বীরাজ সেন।

শবরী মিত্র

অমৃতা রায়

তানিয়া চক্রবর্তী

মনিকা চক্রবর্তী

ভিক্টর মিত্র

সমিতা চক্রবর্তী

সায়নী দে

সুমনা দে মল্লিক

কলকাতার দুর্গাপুজো আদি কথা

--চন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভারত

বাংলার দূর্গাপুজোর সম্পর্কে লিখতে গেলে- বিশেষত কলকাতার পুজো তাহলে ,সেইটা শুরু হয়েছে বেশকিছু পড়ে কারণ পলাশীর যুদ্ধের আগে কলকাতা ছিল মূলতঃ গ্রাম। সিরাজউদ্দৌলা কে পরাজিত করে, হত্যা করে রবার্ট ক্লাইভ সদর্পে এসে জাঁকিয়ে বসলেন কলকাতায় । এখন থেকে বঙ্গদেশের রাজধানী আর মুর্শিদাবাদ নয় ,হবে কলকাতা। তবে তার আগে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে কলকাতাকে। গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে শহরে উন্নীত হবে সে । তাই নতুন করে গড়ে ওঠা কলকাতা দুভাগে বিভক্ত হল। লালদীঘি বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ার থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী অব্দি সাহেবপাড়া বা হোয়াইট টাউন । বাকি পূর্ব-উত্তর ঘিরে তখন কালা অঞ্চল বা ব্ল্যাকটাউন। এই ব্ল্যাক টাউনে হোগলা পাতার মেটে বাড়ি পচা নর্দমার ভেতর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল প্রাসাদ, জ্বলে উঠলো ঝাড়বাতির আলো, অন্দর মহল, বৈঠকখানা, খাজাঞ্চিখানা, তোষাখানা । এই ব্ল্যাক টাউনেই জন্ম নেয় কলকাতার অহংকার বাবু সম্প্রদায় । আরে বাবু সম্প্রদায়ের হাতেই শুরু হয় কলকাতার দুর্গাপুজো ।

কিন্তু তারও আগে ১৬১০ সালে বেহালায় বরিশা অঞ্চলে লক্ষীকান্ত গাঙ্গুলীর আটচালায় মা দুর্গার পূজা শুরু হয় । বেজে ওঠে ঢাক । ১৬০৮ সালে লক্ষীকান্ত সম্রাট আকবরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আটটি পরগনার একছত্র জমিদারি । তার ভেতরে থাকলো সুতানুটি ,কলকাতা ,গোবিন্দপুর । রাজা মানসিংহ দিলেন উপাধি "চৌধুরী" ।
লক্ষীকান্ত বংশধর কেশব বাদশাহ র কাছ থেকে পরে আবার পান " রায়চৌধুরী " উপাধি। বংশের গোত্র সাবর্ণ , সেই থেকে -বংশের নাম সাবর্ণ রায়চৌধুরী। কিন্তু সুদূর বেহালায় বরিশা থেকে সাবর্ণদের আটচালায় ঢাকের আওয়াজ পৌছাতো না তখনকার জলে জঙ্গলে ভরা গ্রাম কলকাতার কালো মানুষগুলোর কাছে । কিছু দূরে সুতানুটিতে তখন অবশ্য বসবাস বাড়ছে , সুতার ব্যবসায়ীরা ভিড় করছে, কিন্তু দুর্গাপুজো ঢাকের আওয়াজ তখন ব্রাত্য সে অঞ্চলে। আস্তে আস্তে গ্রাম কলকাতার নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল। কলকাতার ব্ল্যাক জমিদার তখন গোবিন্দরাম মিত্র । গোবিন্দরাম ই প্রথম ব্ল্যাক টাউনের অন্ধকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শুরু করলেন দুর্গাপুজো। বোধনের দিন তিনি প্রায় ১০০০ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কে দান করতেন কাপড় জামা আর রুপোর বাসন। যতদূর জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল আমলে বাংলাদেশের শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়।

কেউ কেউ বলেন রমেশ শাস্ত্রী মশাই এর পরামর্শে তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ন প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রথম শারদীয় দূর্গোৎসবের প্রবর্তন করেন । পরে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাদুরিয়ার রাজা জগৎনারায়ন প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন । তারপর থেকে অন্যান্য হিন্দু রাজা ভূঁইয়ারা নিয়মিতভাবে এই দুই পূজা আরম্ভ করেন তখনকার মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যে এই দুর্গোৎসব স্বভাবতই একটা সামাজিক লোকোৎসবে পরিণত হয়।
তবেই দুর্গাপূজার প্রচলন নিয়ে অন্য যে তথ্যটি পাওয়া যায় বিশেষজ্ঞদের মতে তাহলো আঠারো শতকের নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুজো । তার আমলেই নাকি নতুন কালের দুর্গাপূজার প্রচলন হয় । দুর্গাপুজোয় বাঈ নাচের প্রচলন তার হাতেই হয় , তবে বাংলার বুকে দুর্গাপুজোকে কালচারে পরিণত করেন নবকৃষ্ণ দেব । ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলাকে হারিয়ে রবার্ট ক্লাইভ এলেন কলকাতা গ্রামে গ্রামে সেভাবে এই জয়কে সেলিব্রেট করার মতো কোনো ব্যবস্থাই নেই । পলাশীর যুদ্ধ জয়ের আনন্দ কে ভাগ করে নেওয়ার জন্য নায়েব থেকে হয়ে ওঠা রাজা নবকৃষ্ণ দেব তার শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজন করলেন দুর্গাপুজোর । মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব এর বাড়ির দুর্গোৎসব সম্পর্কে বলেছেন "The majority of company crowded to raja nabakessen's where several mimies attempted to imitate the manners of different nations".
নায়েব থেকে রাজা নবকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন মহারাজ নবকৃষ্ণ। জৌলুশে খ্যাতিতে তখন নবকৃষ্ণ দেব এর দুর্গাপুজো মধ্যগগনে জ্বলজ্বল করছে , স্বয়ং রবার্ট ক্লাইভ এসে নৈশভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন নবকৃষ্ণের বাড়ি । খাবার ,সুরা আর বাঈ নাচের জৌলুসেসে পুজা হয়ে উঠল সর্বসেরা । নবকৃষ্ণের দেখাদেখি কলকাতার অন্য বাবুরাও তখন মেতে উঠলেন দুর্গাপুজোয় । বাবুদের বাবুয়ানি র কেতা দেখানোর নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল । নবকৃষ্ণ বাড়ির পুজো শুরুর পরপরই শুরু হয় হাটখোলা দত্ত বাড়িতে । এছাড়াও রাজা সুখময় রায়ের বাড়ি , দর্জি পাড়ার মিত্র দের বাড়ি ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাড়ি এমনকি স্বয়ং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মেতেছিলেন দুর্গা পূজোয় । গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক ঠাকুরদালান । জমিদারবাড়ির ঠাকুরদালান রাজসিক ব্যাপার । ঠাকুরদালান গুলির একটাই বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রত্যেক ঠাকুরদালানে এই পাঁচটি করে খিলান বা আর্চ আছে । এই ঠাকুরদালান গঠনের মধ্যেও বাবুদের নিজস্ব প্রতিপত্তি দেখানোর গোপন প্রয়াস অবশ্যই লুকিয়ে থাকত।

সেকালের বনেদি কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো গুলোর মধ্যে সুপ্ত প্রতিপত্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা লুকিয়ে ছিল, তা থেকে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল - সেকালের কলকাতায় নাকি মা গয়না পরতে আসতেন দাঁ বাড়িতে , খাবার খান চোর বাগানের মিত্র বাড়িতে আর গান বাজনা শোভাবাজার রাজবাড়িতে। অন্তপুরের মহিলাদের সেসময় গয়নার বৈভব দেখিয়ে তুষ্টি লাভ করতে হতো । পুজোর ক'দিন মায়ের প্রসাদ লাভের জন্য জমিদার বাড়ির সামনে সাধারণ মানুষদের ভিড় হতো । কিন্তু কোন বাবু কতজনকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে কত প্রণামী দিয়ে বিদায় করছেন তার ওপর সেই বাবুর "বাবুত্ব" নির্ভর করত । আর ছিল বাঈ নাচের টক্কর । শারোদোৎসবে সে যুগের বাঈ নৃত্যের ছবির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে পুজো ছিল উপলক্ষ মাত্র এই পূজাকে কেন্দ্র করেই চলতে বাবুদের ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী ।এবং অবশ্যই ইংরেজদের দেখানোর মাধ্যমে তাদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার দৌড় । দুর্গাপুজোয় রাজা নবকৃষ্ণ দেব যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার নাচঘর বোধহয় সেরকম আর কেউ পারেননি সেসময় বেনারস ,কাশ্মীর অঞ্চল থেকে মুসলিম বাঈরা এসে আসর মাতিয়ে তুলতেন । একটা সময় গেছে যখন কলকাতার দুর্গোৎসবের রাতকে নাচে-গানে ফুটন্ত করে তুলতো একজনই । সে বাঈজী নিকি অথবা নেক্কি ।সেই তখন সেরা । রাজা রামমোহনের বাড়িতেও পূজোর সময় নাকি নিকির নাচ হয়েছিল । হয়েছিল ছাতুবাবু বাবুদের বাড়ি। আবার রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতেও নিকি প্রধান নর্তকি । নিকির পায়ে যেমন নাচের বোল তেমনি গলায় সুরের জোর। ইউরোপীয়দের কাছে সবচেয়ে তারিফ যে "সোপ্রানো " সে সুর নিকির গলায় অনায়াসেই মেলে যেত, সেই উচ্চ সপ্তকের সুর ।

নিকি সম্পর্কে সেকালের ইংরেজি কাগজ এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে " চিফ সিঙ্গার নিকি এন্ড আসারুন হু ওয়ার এনগেজড বাই নীলমণি মল্লিক এন্ড রাজা রামচন্দ্র " নিকির পরেই যার খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন ইলাহীজান । ইলাহি ছাড়াও আরও ছিলেন কাশ্মীরি কন্যা বুনু আশারুম বা আশারুখ , বেনারসের জীনত, ফৈজ বক্স, বেগম জান , হিজন ,হয়তো ছিলেন আরো অনেকে কিন্তু ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় তাদের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না।
শ্রীমতি ফেনী পার্কস এসেছিলেন কলকাতা ১৮২২ সালের নভেম্বর মাসে । তার স্বামী ছিলেন কোম্পানির উচ্চপর্যায়ের সিভিলিয়ান । স্বামীর সঙ্গে প্রায় সারা ভারত বর্ষ ঘুরেছেন শ্রীমতি ।কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার হাতের আঁকা ডায়েরি লেখা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন । সে যুগের সমাজ দর্পণ এর ছবি তিনি লিখেছেন তার ডায়রিতে অক্টোবার ,১৮২৩। সেদিন দুর্গা পূজো দেখিতে গিয়েছিলাম ,একজন বণিক বাঙালি বাবুর বাড়ি ।মধ্যিখানে বিরাট উঠোন। সেই উঠোন এর একপাশে উঁচু মঞ্চের ওপর দেবী দুর্গার সিংহাসন পাতা । সিংহাসনের ওপর দুর্গার মাটির প্রতিমা প্রতিষ্টিত ব্রাহ্মণেরা উপবিষ্ট, পূজার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত । প্রতিমার হাত দশটি। যার জন্য দুর্গা দশভুজা বলে পরিচিত । পূজা মন্ডপের পাশের একটি বড় ঘরে নানা রকমের উপাদেয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল , খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসি মদ্য ও ছিল প্রচুর । অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে পশ্চিমা বাঈজী দের নাচ গান হচ্ছিল আর ইউরোপীয় ও দেশী ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন । বাইরে ও বহু সাধারণ লোকের ভিড় হয়েছিল বাইজিদের গান শোনার জন্য ।গানের হিন্দুস্থানী সুর সমাগত লোকজনদের মাতিয়ে তুলেছিল আনন্দে।

নাচ-গান খানাপিনা ছাড়াও পুজোয় আর একটা বড় মানুষই ছিল বাবুদের ঋণের দায় কয়েদিদের মুক্ত করা । কোনো কোনো বাবু সাধ্য মতো তাদের মুক্ত করতেন । সেকালের নিয়ম ছিল ঋণের টাকা মিটিয়ে দিলে কয়েদিদের ছেড়ে দেওয়া হতো বিশেষ করে ইংরেজ কয়েদিদের।

তবে পুজোয় এই প্রতিযোগিতার মধ্যে ও সাধারণ মানুষ সেকালে প্রাণভরে নিষ্ঠা সহকারে পুজো করতে নিজের বাড়িতে, তবে রেষারেষির পুজো যে ছিল তা নয় বড়বাবু চারিটা ঢোল , দুইটা ঢাক রাখিয়াছে আমার ৮টা ঢোল আর ৪টা ঢাক রাখিতে হইবে ওখানে দুইটা পাঁঠা বলি হবে আমি ৮টা পাঁঠা বলি দিব।

কলকাতা বাবু কালচার এর যে ঐশ্বর্য যে প্রতিপত্তির লড়াই আজও চলছে ,শুধু সময়ের স্রোতে বাবু কালচার এর চিত্র পাল্টে গেছে কর্পোরেট কালচারে।

বঙ্গদেশে দূর্গা পূজার ইতিবৃত

প্রায় ৪৩০ বছর আগের কথা-...

--ডঃ সমাপ্তি ভট্টাচার্য্য, ভারত

বঙ্গদেশে তখন বারো ভুঁইয়ার রাজত্বকাল। যেমন-প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ঈষা খাঁ, চাঁদ গাজী, কংসনারায়ান রায় ইত্যাদি। তাহেরপুরের (বর্তমানে বাংলা দেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলায় অবস্থিত) রাজা কংসনারায়নের চোখে ঘুম নেই। বিনিদ্র রজনী যাপনে দুই চক্ষু কিছুটা রক্তবর্ণ।মানসিক উত্তেজনায় দেহ কেঁপে উঠছে। মাথার ব্যথায় কিছুটা কাতরও বটে। কিন্তু তিনি নিরুপায় কারণ গুপ্তচরেরা যে সকল সংবাদ বহন করে আনছে, তাতে আর চুপ করে থাকা যায় না। বড় জমিদার ও ছোটো খাটো রাজারা এবং সীমান্তবর্তী রাজ্যের কিছু প্রভাবশালী জমিদাররা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। এর ফলে যে কেবলমাত্র তাহেরপুরের ক্ষতি হবে তা নয়, সারা বাংলা দেশের ক্ষতি। হার্মাদ ও ওলন্দাজদের মোকাবিলায় কেদার রায় অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে আরও ভয়ংকর বিপদ এগিয়ে আসছে। কারণ মোঘলদেরও নাকি দৃষ্টি পড়েছে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের ওপর। এর প্রতিকার কি?
রাজা কংসনারায়ণ ইতিমধ্যেই পরামর্শ করেছেন মহামন্ত্রী ও সৈন্যদলের অধ্যক্ষের সঙ্গে। যদিও এখনও এই জমিদারেরা নিয়মিত কর জমা দেন রাজকোষে, কিন্তু আর কত দিন? এই বিদ্রহের ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে এবং সেটা বলপ্রয়োগ করেই। কিন্তু এই কাজে ব্রতী হওয়ার আগে কুলগুরুর পরামর্শ ও আশীর্বাদ অতি অবশ্যই প্রয়োজন। অতএব এখনই বজরা পাঠাও গুরুদেব শ্রীরমেশচন্দ্র মিশ্রাচার্যের কাছে।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে রমেশচন্দ্র -স্বাত্তিক ব্রাম্ভণ, এলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়াণের প্রাসাদে। গুরুদেবকে প্রণাম করে তখনি তাঁকে নিয়ে এলেন মন্ত্রাণাকক্ষে। মহামন্ত্রী ও সেনাধক্ষ্য ইতিমধেই সে কক্ষে উপস্থিত। কুলগুরু রমেশচন্দ্র ও রাজা কংসনারায়ণ প্রবেশ করা মাত্রই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে রাজাকে অভিবাদন করলেন। রমেশ্চন্দ্র আসন গ্রহন করার পর সবাই তাঁকে ঘিরে বসলেন। রুদ্ধদ্বার মন্ত্রনাকক্ষের বাইরে প্রহরীরা সতর্ক পাহারায়ে। চিন্তান্বিত রাজা কংসনারায়াণ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও আসন্ন বিপদের কথা বললেন রমেশ্চন্দ্রকে, এবং প্রস্তাব দিলেন একটি রাজসূয় যজ্ঞ করার।রাজার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত ও চিন্তান্নিত হলেন রমেশচন্দ্র, তবে তা মুহূর্তের জন্য।– সেকি মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞ করতে হলে বঙ্গ দেশের সব রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করে আপনাকে রাজ চক্রবর্তী হিসাবে মেনে নিতে হবে। আর তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং সমস্যা আর প্রবল হবে। কংসনারায়াণ বললেন এর পরিবর্তে যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি,তাতে আপনার সম্মতি আছে তো?

মৃদু হেসে গুরু রমেশচন্দ্র বল্লেন- মহারাজ, এর ফল কিন্তু একই হবে।আমি শাস্ত্রসম্মত ভাবে পূজা অর্চ্চনা করে অশ্বের মস্তকে চন্দন টীকা লাগিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে অশ্ব কে ছেড়ে দেব।যে যে রাজা এই অশ্বকে আটকাবে, তাদের সঙ্গে সেই যুদ্ধই তো হবে। রাজা কংসনারায়ণ খানিক মুখ নিচু করে চিন্তা করতে লাগলেন...চুপ করে বসে রইলেন। তারপর হতাশ গলায় কুলগুরু কে জিজ্ঞাসা করলেন- তাহলে আমি কি করব? কিছু একটা তো করতেই হবে! তা না হলে সবাইকে এক জোট করব কি করে?শত্রুদের প্রতিরোধ করব কোন উপায়ে?
পন্ডিত রমেশচন্দ্র এবার ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষন পরে চোখ আস্তে আস্তে খুলে সস্নেহে বললেন-- মহারাজ, ভারতের ইতিহাস লোভ, অসূয়া, পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, হিংসা, কলহ, ক্রোধ শূণ্যগর্ভ অহংকারে ভরা। বংগদেশ ভারতেরই অংশবিশেষ। এই অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন।

কেউ ধর্মের পথে, কেউ বা সৌর্যের পথে অর্থাত গায়ের জোরে। বাহুবলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম একতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। এই নির্বোধ বিকৃত দূষণ দূর করতে হলে শুভবুদ্ধি, সম্পন্ন সৎ মানুষদের একত্র করা প্রয়োজন। কংসনারায়ণ হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন-- সে কি করে সম্ভব?! গুরুদেব এ তো অসম্ভব কাজ। স্মিত হেসে রমেশচন্দ্র বললেন-- উপায় আছে। মহারাজ, আপনি শ্রীশ্রীদূর্গা পূজা করুন। এতে আপনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করবেন। রাজা কংসনারায়াণের এবার বোধকরি ধৈর্য্য চুতি ঘটল। কিঞ্চিত রাগত স্বরে বললেন, সে ত বাসন্তী পূজা! এই তো সেদিন হয়ে গেল। আবার?!

শান্ত স্বভাব ও স্হিতধী মহাপন্ডিত কুলগুরু বললেন মহারাজ, এ পূজা সূরথরাজার পূজা নয়। এটী হবে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধানের দূর্গা পূজা! রাবন বধের পূর্বে অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার জন্য এই দূর্গা পূজা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, - যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। এই পূজার সময় শরতকাল। বর্ষা চলে গেছে, পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মত মেঘ। সাদা কাশফুলে ঢাকা পড়েছে প্রান্তর। পদ্মফুল ফুটতে শুরু করেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য ভারে ফসল নুইয়ে পরেছে। মৃদু মন্দ হাওয়ায় তার সুবাস পথিক ও চাষীদের মনে অনাবিল আনন্দ এনে দিয়েছে। এই যে শরতকাল শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের দূর্গা পূজার সুন্দর সময়। মহারাজ এই পূজা উপলক্ষে আপনি সকল রাজা, জমিদার, প্রজা এবং অবশ্যই পার্শ্ববর্তী ভূঁইয়াদের সাদর আহ্বাণ জানান। তাঁরা যেন সপরিবারে ও সপার্ষদ এতে অংশগ্রহণ করেন।

এই পূজা পাঁচ-ছয় দিন চলবে। অনেক সময়ে পাবেন। সকলের সংগে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারবেন। তাঁদের মনভাব জানতে পারবেন এবং আগামী বছর ও তাদের উপস্থিতি কামনা করবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, ধর্মপ্রাণ বঙ্গ সমাজ আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেনা। এর ফলে বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তক্ষয়ে আপনি সকলের মন জয় করে সবাইকেই এক ছাতার নীচে আনতে পারবেন। একবার চেষ্টা করে দেখুন - উদ্যোগী পুরুষের জয় অবশ্যম্ভাবী। তখুনই রাজা কংসনারায়ণ রাজী হলেন। রমেশচন্দ্র দূর্গা পূজার নির্ঘন্ট তৈরী করলেন। চন্ডী থেকে মন্ত্র সংকলন করলেন। নিজের রচিত কিছু মন্ত্র সংযোজন করলেন। যথা সময়ে বহুরাজা, জমিদার এবং সাধারন মানুষের উপস্থিতিতে পূজা শুরু হল। অপরাপর রাজন্য ব্রিন্দ রাজা কংসনারায়ণের আতিথেয়তায়ে মুগ্ধ হলেন। নিষ্ঠাভরা শ্রীরমেশ্চন্দ্রের পূজা দেখে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। ৫/৬ দিন সবাই একসংগে থেকে এবং নানা বিষয়ে বাক্যালাপ করে নিজেদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করলেন। ফিরে গেলেন পূনর্বার আসবার অংগীকার করে।
পরবর্তী কালে এই রাজা ও জমিদারেরা নিজ নিজ রাজ্যে শ্রীশ্রীদূর্গাপূজা অর্থাৎ অকাল বোধনের পূজা করতে শুরু করলেন। কালঃক্রমে সারা বাংলার বুকে দূর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হল।
তাই, আজ আমার চমক লাগে যখন দেখি বাঙ্গালী সমাজ এই পূজা নিয়ে গেছে সুদূর আমেরিকা, ইয়োরোপ, মধ্য-প্রাচ্যে এমনকি মাস্কাটেও। মা দূর্গাকে প্রনাম জানিয়ে, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং রামেশচন্দ্র মিশ্রাচার্য্যকে স্মরণ করে এই উপাক্ষ্যানের সমাপ্তি করি। সকলের মঙ্গল হক, প্রেম, প্রীতি ভালবাসায় ভরে উঠুক সকলের জীবন। মা দূর্গার আশীর্বাদে এই ধরায় শান্তি বিরাজ করুক। ইহাই প্রার্থনা।

শারদীয়ার উষ্ণ আবেগ

--স্বাতী রায়, ভারত

আমাদের বড় আনন্দের দিন আসছে। মা আসছেন। দিকে-দিকে তার মনে পড়িয়ে দেওয়া গান। আজ হঠাৎ অনেকদিন আগের এক শরৎকালের কথা মনে পড়ে গেল। শহুরে, হাটুরে জীবন থেকে একটু সরে সে এক অন্য শারদীয়া।
যতদূর মনে পড়ছে, সে ১৯৮৯ সালের কথা। ডাক পেয়েছিলাম বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ির পুজো দেখার।
গ্রামের নাম রসুই। কাটোয়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে। বাস থামল অজয় নদের এপাশে। আমাদের যেতে হবে ওইপারে। বর্ষার জেল্লা নেই এখন। শুকিয়ে যাওয়া নদ এখন মায়ের শাড়ীর পাড়ের মতো। একপেশে, শীর্ণ। ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। চড়ায় ঝলমল করা কাশের মধ্যে দিয়ে অনেকটা হেঁটে পৌঁছনো গেল মুখার্জী বাড়ি।

মুড়ি, নারকোল, কলা, দুধে শরীর চাঙ্গা করে দুর্গাবাড়িতে। তখন প্রতিমার সামনে ঢাকিদের কেরামতির প্রতিযোগিতা চলছে বেদম। দশমীর দিনে সাপুড়েরাও এসেছিল। দেখিয়েছিল নানা রকমের সাপের খেলা। এখানে এই সবই রেওয়াজ।
এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব কিছুর বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। শুধু যা ভাল লেগেছিল তা হল আড়ম্বরহীন অর্চনা, শুদ্ধ উচ্চারণে তিনজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের সমবেত মন্ত্র উচ্চারণ, মায়ামদির পরিবেশ, বিসর্জনের দিনে অজয়ের পাড়ে শব্দহীন আতসবাজীর খেলা আর তারপর সেই আলগা চাঁদের আলো ভাসিয়ে দেওয়া স্রোতের তীরে বসে সকলে মিলে গান।
আর হ্যাঁ, ওই একবারই বিসর্জনের আগে প্রতিমার চোখে সত্যিকারের জল দেখেছিলাম।

এবারের পুজো

--বর্ণালী গাঙ্গুলী,ভারত

টুপটাপ টুপটাপ পড়ছে ঝরে , একি শিউলি নাকি?
শরৎ তুই কখন এলি দিয়ে এমন ফাঁকি,
কাশের বন দুলছে হাওয়ায় কেমন শিশির মেখে
মায়ের আসার সময় হল জানান দিল ডেকে।
বুঝলাম না তো এবছরটা কেমন গেল ঘুরে
মহালয়া পেরিয়ে গেল আগমনীর সুরে,
এ কেমন দিন এল যে সবাই আতঙ্কিত
গৃহবন্দী আজকে সবাই বাহির থেকে বঞ্চিত।
নেই আনন্দ, নেই উচ্ছ্বাস, নেই কোনও উত্তেজনা
না আছে বাজার ঘোরা , না আছে নতুন জামা কেনা,
নেই কোনও রিহার্সাল, নাচ-গান বা ব্যস্ততা
ভীষণভাবে হারাচ্ছি আজ পুজোর আগের সেই আড্ডাটা।
বাঙালীর বছর ঘোরে পুজোর থেকে পুজো
হাওয়ায় কেমন রং লেগে যায় চারিদিক সাজো সাজো,
আসছে বছর আবার হবে বলেছিলাম মাগো
তবে কেন এমন হল বুঝতে পেলাম নাকো।
করলি নাকি অভিমান তুই মর্ত্যবাসীর পরে?
ডাকছে না কেউ আর তোকে প্রাণ-মন ভরে?
মত্ত সবাই সাজগোজ আর খাওয়া দেওয়া নিয়ে
প্রতিযোগিতা প্যান্ডেল সজ্জা আর আলোক সজ্জা নিয়ে;
ব্যস্ত সবাই ঘুরতে ফিরতে , নাচ-গান আর নাটকেতে
দেখছিস মা তুই কতই কান্ড দাঁড়িয়ে একা প্যান্ডেলেতে।
তাই কি এবার ইচ্ছে হল একাই ঘুরে যাবি?
ভীড় ,আড়ম্বর ,হই হট্টোগোল থেকে মুক্তি পাবি!
তাই যদি চাস মা, তবে তাই হোক এবার
প্রাণ ভরে স্মরণ করি ঘরেই তোকে এবার,
ঢাক- ঢোল নাইবা হল, নাইবা বাজল কাঁসর ঘন্টা,
মনের ভক্তি আসল পুজো ,নেই দরকার এত ঘটা।
প্রাণ ভরে মা ডাকছি এবার ভীষণ ভাবে তোকে
দমন কর এই দৈত্যটাকে যেমন করেছিলি মহিষাসুর টাকে,
ফিরিয়ে দে আবার ঝলমলে দিন সবার মুখের হাসি
আসছে বছর পুজোর তরে স্বপ্ন রাশি রাশি।।

আমন্ত্রণ

--মানস মন্ডল,ভারত

একই সরলরেখায় দাঁড়িয়ে আছে দুই বিমূর্ত নারী
তার মধ্যবর্তী প্রতিটি জ্যা-বিন্দুতে জ্বলছে নিভছে
প্রসারিত নীলচে আলো।
আর আমি অপলক দেখতে পাই
তৃষ্ণার্ত এক চাতক উত্তাপ খুঁজে নিচ্ছে
অন্তর-বাস-হীন স্বপ্ন যোজনায়।
ক্রমেই শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে
ছড়িয়ে পড়ছে নিমীলিত অঢেল বৃষ্টিকণা।
সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে নিনাদিত হয়ে ওঠে বয়ঃসন্ধি পেরোনো বীজতলার বাঁশি---
খরাক্লিষ্ট মিথুন পথের পাঁচালী।
এরা সব জানে,
ঠিক কখন কোথায় কোন শৃঙ্গারে ঝরে পড়তে হয় শূন্য থেকে শূন্যতায়,
ইয়াসের সামুদ্রিক উচ্ছ্বাসে।

সকলেই কম বেশি জানে কামনার রং একাধিক,
জীবনের গতি নানাবিধ।
তাই ইচ্ছে তীব্র হলেই, কাঙ্ক্ষিত কোনো মেঘকে
ডেকে আনে তার নিজস্ব নির্জনতায়।
বুকে অঢেল জলকণা নিয়ে মেঘও ঠিক নেমে আসে বৃষ্টিধারা হয়ে-----
প্লাবিত জলোচ্ছ্বাসে প্রশমিত করে তার রম্য উচ্চারণ ।

তারপর কোলাহল থেমে যায়,
মেঘে মেঘে গড়ায় বেলা, রাত্রি নামে।
বৃষ্টি-গভীর আমন্ত্রণে শব্দে বর্ণে জাগে মেঘমল্লার :
"বুকের ভেতর মেঘ জমেছে, বৃষ্টি সারাদিন,
চির সবুজ পাতার ফাঁকে স্বপ্নেরা উড্ডীন।
স্পর্শ বাজে ঘাসের ডগায় যেখানে ফুল ফোটে,
মেঘের দেশে তবুও বাতাস একলা মাথা কোটে।
সাদা পাতায় বাজছে কি সেই অলীক হাহাকার,
শব্দে শব্দে বিবাহ প্রস্তাব, জীবন পারাপার।"

অভিশপ্ত প্রাণ

-মৌমিতা চক্রবর্ত্তী, ভারত

আমি হলাম সেই মেয়েটি
ধনী বাবার প্রাণ
আমিই কভু গরীব বাবার
অভিশপ্ত ত্রাণ।

দশ পুত্র সম কন্যা
লোকে যাকে বলে
সেই আমিকেই মারছে তারা
নানান কৌশলে।

বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি
অনেক বাড়িই আছে
আসল বাড়ি কোথায় পাব
নেই তো ধরার মাঝে।

সমাজ মোরে নষ্ট বলে
কান পেতে সব শুনি
যে লোক মোরে নষ্ট করে
সেই যে আসল গুনী।

যে ঘর মোরে চায় না মাগো
সেই ঘর চায় বউ
ভুল করে মা যদিও আসি
ছাড়ে না মোরে কেউ।

মাগো যদি সত্যিই থাকো
তবে অস্ত্র ধরো,
মোদের মনে শক্তি দিয়ে
এ পাপ দূর করো।।

ঢেকে রাখো

-রণজিৎ বিশ্বাস, ভারত

ভালোবাসার স্বাধীনতাকে
নীরবে ঢেকে রাখ কিছুক্ষণ
গোধূলির মিমির ভিজিয়ে দেবে
তোমার নরম শরীর
পিপাসার ফুলগুলি ঝরে পড়ে-
গভীর রাতে
তোমরা কেউ তা বোঝ না
যদি বলো,
যেতে পারি কল্পনার দেয়াল ভেঙে।
রাত পাখী হয়ে উড়ে যাব
এ পাহাড় থেকে সে পাহাড় -
তবুও মন ভেঙে যায়
প্রতিদিনের সূর্য ওঠার মত।

বাকি কথা'রা

--সঞ্জয় চক্রবর্তী ,অধুনা সিডনী

ছেড়ে ফেলে রাখা দুটো সাদা পাতা
আঁকিবুকি ফের লেখে,
বোবা ডাইরির হলদেটে পাতা
কা'কে আজও খুঁজে দেখে,
কাঁচা কাঁচা আঁকা, রংয়ে রং মাখা
শব্দ-কোলাজ এঁকে,
সময়ও কিছু'টা দূরে সরে গেছে
আমাদের কাছ থেকে,
আয়না-জলেতে ফের দেখি মুখ
বলিরেখা গেছে সেঁটে,
সময়ের স্রোত ডুবিয়েছে তাই
পারেনি যে কাছে যেতে,
তারও বুঝি আজ ঝরে গেছে পাতা,
কালো মেঘে সাদা পাক,
বাকি কথা আজ জমে জমে বাড়ে,
নাহয় ... কিছু কথা বাকি থাক?

ভালোবাসা একটি প্রজাপতির নাম

--রেইনি চৌধুরী, ভারত

জমা রাখা অবসন্নতা দিয়ে
বেসেছ ভালো
শূণ্য বাগানে তাই ফুলের বন্যা এসেছে।
দোল খাচ্ছে ফল,আর দিগন্ত ঢাকা দেওয়া
রঙিন পাখায় লেখা হচ্ছে একটি অনুসিদ্ধান্ত
ভালোবাসা একটি প্রজাপতির নাম।

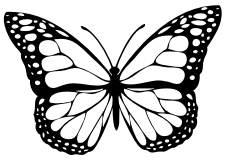

আমার পূজা

দুর্গাপুজো: স্মৃতির মনিকোঠা থেকে

--ডঃ মধুব্রতা চ্যাটার্জী, লন্ডন

সকাল থেকেই ঝলমলে রোদ উঠেছে। ব্রিটেনে এরকম রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ সচরাচর দেখা যায় না। তাও আবার সেপ্টেম্বর মাসে। সারা বছর জুড়েই প্রায় মেঘলা ছাইরঙা আকাশ। তাই রবিবারের সকালে বারান্দায় দোলনায় বসে শরতের আকাশ দেখতে দেখতে স্মৃতির অতলে ডুব দিতে ভারী ভালো লাগছে।

আমার জন্ম উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া তে। সামনেই বিশাল টালা পার্ক। এই পার্কে নানান রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা রাস্তা ছিল। আর সেটা পেরোলেই ছিল আমার মামারবাড়ি। তাই প্রায়শই স্কুলের পর সন্ধ্যেবেলা হলে চলে যেতাম মায়ের সাথে। মামারবাড়ি এমনিতেই সারাবছর জমজমাট থাকতো, কিন্তু বিশেষ করে পুজোর সময় একটা আলাদাই উৎসব উৎসব পরিবেশ তৈরি হতো কারণ পুজোর ছুটিতে আমার যেসব মাসতুতো ভাই বোনেরা দূরে থাকত তারাও চলে আসতো মামার বাড়িতে।

আর সব বাঙালি পরিবারের মতো পুজোর সময় আমরা ভাইবোনেরা একসঙ্গে ঘুরতে বেরোতাম। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা তো ছিলই, তবে টালা পার্কের পুজো ছিল আমাদের বিশেষ পছন্দের। তার একটা অন্যতম কারণ ছিল এই পুজোর মাঠে যে বিরাট এক মেলা বসতো সেটা। বেলুন ফাটানো আইসক্রিম ফুচকা খাওয়া সব মিলিয়ে দেদার করতাম কাঁচের শিশি থেকে একরকম ছোট্ট ছোট্ট গুলি পাওয়া যেত ওই মেলায় প্রতিবছর ওটা আমার চাই চাই আর ছিল হরেক রকম ছোট্ট ছোট্ট জিনিসের দোকান শিশুমনে ওইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসের প্রভাব ছিল অপরিসীম কি করে যে পুজোর দিনগুলো কেটে যেত বুঝতেই পারতাম না।

যখন আরেকটু বড় হলাম, তখন আমাদের বাড়িতে দুর্গা পুজো আরম্ভ করলেন আমার মা-বাবা। একচালা প্রতিমা এনে পুজো হতো। ছাদে প্যান্ডেলও বাঁধা হতো। তখন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা টা একটু কমে এসেছিল। বেশিরভাগ সময়টা বাড়ির পুজোতেই কাটত। সে এক অন্যরকমের আনন্দের স্বাদ। এরপর বহু বছর কেটে গেছে। ইউরোপে আসার পরও এক যুগ কেটে গেছে চোখের নিমেষে। এখন ইংল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ড এর মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে কাটে বছরের বেশিরভাগ সময়টা। মাঝে মাত্র দু বার সুযোগ হয়েছিল পুজোর সময় কলকাতা যাওয়ার। তবে তাতে এই কবছরে পুজোর আনন্দে ভাটা পড়েনি একটুও। বিদেশের মাটিতেও বেশ হইহই করে কাটে এখন পুজোর দিন গুলো। এর মধ্যে ২০১৪ তে সুযোগ হয়েছিল উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পুজো দেখার। গিয়েছিলাম কানাডার টরন্টো শহরে একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে। কিন্তু পুজোর সময় মা দুর্গার দর্শন করতে পারব না ভেবে আমার বাঙালি মন ছটফট করে উঠলো। ইন্টারনেটে একটু খুজতেই পেয়ে গেলাম টরন্টোর পূজা গুলির সন্ধান। তারপর একদিন পৌঁছে গেলাম কালীবাড়িতে মা দুর্গার দর্শন করতে। পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে, আরতী দেখে, ভোগ খেয়ে মন তৃপ্ত হলো।

ইতিমধ্যে গত বারো বছরে সুইজারল্যান্ডের বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, সুইস পুজোর সদস্যদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এতটাই মধুর সম্পর্ক যে এই বছর সবাই ভালোবেসে ভরসা করে আমাকে অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বটি সামলানোর ভার দিয়েছেন। আর তার জন্য আমি অন্তর থেকে সকল সদস্যের প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

পুজোর আর মাত্র একমাস বাকি। তাই সুইস পুজোর সকলে মিলে আপ্রাণ খেটে চলেছি যাতে মায়ের পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সুইস পুজো অ্যাসোসিয়েশনের পুজো হয় একদম পঞ্জিকা মেনে। পঞ্চমী থেকে দশমী পূজা - পরিবারের সকলে পূজা প্রাঙ্গণে একত্রিত হন। সকলে মিলে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া, ভোগ খাওয়া, আড্ডা দেওয়া সব মিলিয়ে সে এক দারুন আনন্দের পরিবেশ। নিয়ম মেনে রীতিনীতি পালন করা হয়। তার সাথে জুরিখ লেক এ কলাবউ স্নান করতে নিয়ে যাওয়ার মতো সুন্দর সব অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিনের মত স্থান করে নেয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয় আর তার প্রস্তুতি চলে বেশ কয়েক মাস আগে থেকে। আর পুজোর পর হয় খুব সুন্দর করে বিজয়া সম্মিলনী।

রোদে বসে দুর্গাপুজোর স্মৃতিচারণা করতে মন্দ লাগছে না আর পাঠকের সঙ্গে তা ভাগ করে নিতেও দিব্যি লাগছে। তবে আজ এখানেই শেষ করি কারণ একটু পরেই বন্ধুরা মিলে দলবেঁধে পুজোর নাচের রিহার্সাল। আর কদিন পরেই পুজো। তাই আবার ভবিষ্যতের জন্য নতুন সুখস্মৃতি তৈরি করার সময় এসে গেছে।

'আমার পুজো-বেলা'

--সুনীল কুমার সরকার, ভারত

দুর্গাপুজোর ক'টা দিন পড়াশুনো বারণ , বন্ধুরা বলত এটা আইন , এই 'আইন'টা স্কুলে পড়তেই জেনে গেছিলাম । সকালে ঘুম থেকে উঠে এক পাক মণ্ডপে ঘুরে আসা , মণ্ডপেই প্রতিমা তৈরি হতো । বুঁদি বাঁধা থেকে মাটি লেপা , পরতের পর পরত , মাটির মূর্তিতে একটু একটু করে যেন প্রাণ দিতে থাকে কুমোরের হাত , একটু একটু করে হয়ে ওঠে জীবন্ত প্রতিমা ! শিল্পীর গায়ের ঘাম নেমে আসে , কপালেও বড় বড় ফোঁটা তবু খেয়াল নেই , চোখে পড়লে চোখ বন্ধ করে নিয়ে আবার কাজ করে । তৈরির সময় প্রতিমার সামনে ও পেছন , সবদিক থেকেই দেখার অধিকার ছিল , আমাদেরই তো রাজত্ব ! সুন্দর প্রতিমার পেছনে বাঁশ-কাঠ-খড়ের কঙ্কাল দেখে মন খারাপ হয়ে গেছিল , কেমন ভয় ভয়ও , আর কোনও দিন পেছন দিকে যাইনি ! লুঙ্গি অথবা মলিন প্যান্ট পড়া শিল্পীদের আমরা পাল বলতাম । শিবুপাল , মন্টুপালদের মতো পৃথিবীর কেউ এত সুন্দর চোখ আঁকতে পারত না । যেদিন চক্ষুদান হতো কিশোর-মনে সে কী উত্তেজনা , খানিক আশঙ্কাও , পালের হাত কেঁপে যাবে না তো ! সববারই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে ।

মনে মনে ভাবতাম , আমি কেন পারিনা ! শিল্পী বিশেষ কথা বলত না । নিবিষ্ট মনে মাটি , তুলি , রং---এসবের মধ্যেই ডুবে থাকত। তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে হত না , প্রতিমা বা ঠাকুরেরই অংশ মনে হতো যেমন ঢাকিকে মনে হতো , এদের সঙ্গে বুঝি ঠাকুরদের ঘনিষ্ঠ যোগ , এরা ঠিক আমাদের মতোন নয় । একজন ঢাকি তার ১২-১৩ বছরের ছেলেকে নিয়ে আসতো , ছেলেটি আমাদের সঙ্গে কথা বলত না , বাবার গায়ে গায়ে থাকতো , এদিক ওদিক তাকাতো , আমাদের দিকেও । পুজোর সময় ঢাকি ঢাক বাজাতো , ছেলেটি কাঁসরঘন্টা । পাড়ার বয়স্ক ও মহিলাদের সঙ্গে ঢাকির বেশ ভাব , দেবতাদের জন্ম ও জীবন নিয়ে কত কথা আর গল্প ! গল্পের ভাষা ও কথা বুঝতাম না । পুজো শেষে ছেলেকে নিয়ে ঢাকি বাড়ি বাড়ি ঢাক বাজিয়ে কিছু সাহায্য চাইতো , যা কিনা পুজোর বকশিস । এই ছয় দিনে একটা সম্পর্ক তো হয়েই যেত , প্রত্যেক বাড়ি থেকে নাড়ু-মুড়ি-চালসহ কিছু পয়সাও পেত । তখন বুঝতাম এরা আসলে খুব গরিব মানুষ , যেভাবে বুঝেছি প্রতিমা বানানো শেষে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মজুরি নিয়ে পালের চাপা দর কষাকষি--- বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে , এই সময়ই তো সারা বছরের আয়টা তুলে নিতে হয় , টাকাটা আরেকটু বাড়ান । মনে হতো , প্রতিমা গড়ার সময় শান্ত -উদাস শিল্পী কি চুপ করে তার ছেলেমেয়ের কথাই ভাবতো !

স্বাচ্ছল্য ছিল না , কিন্তু শুকতারা-আনন্দমেলা'র পুজোবার্ষিকী দিন পনেরো আগেই চলে আসতো , বোনের সঙ্গে টানাটানি করতে গিয়ে আনন্দমেলার পাতা খানিক ছিঁড়েওছে । সেজদার বন্ধুরা এসে দেশ-আনন্দবাজার ওল্টাতো আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে গল্প করতো , হাসতো । দাদার চেয়ে বড় দিদি , তার বন্ধুর বাড়ি থেকে নব কল্লোল বা আনন্দলোক নিয়ে আসতো , ব্যাগে ভরে। আনন্দলোক উল্টে ছবি দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছি , চোখ পাকিয়ে দিদি বলতো , এগুলো বড়দের ! পুজো মানেই পাড়ার মণ্ডপে মাইকে বাজতো পুজোসংখ্যার গান---আশা , লতা , কিশোর । কিশোরমনে মুগ্ধতার রঙ ছড়িয়ে দিত , সব গানগুলোই মনে হতো---এ তো আমারই কথা ! পাড়ার সমবয়সী ও একটু ছোট মেয়েদেরকে গানগুলো যেন আরো সুন্দর করে তুলতো । পুজোর দিনগুলির খানিক মুক্তি , মাইকের গান আর বাতাসের সুর ক্ষণিকের ভালোবাসার বীজও রুয়ে দিত । তাকিয়ে দেখার আখ্যান শুরু হতো , প্রতিমার মুখের সঙ্গে আমার ছেলেবেলার মেয়েগুলোর মুখ মেলাতাম , শুরু হতো মুগ্ধতার রঙ মাখা । এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ওদের মুখে , শরীরে ভালোবাসারা নেমে আসতো । ক'দিন এই নেশাও আচ্ছন্ন করে রাখতো।

এখনও যখন কালেভদ্রে সেই গানগুলি কানে ভেসে আসে , সেই আনমনা দুপুরের আদুরে মুখগুলি ফিরে ফিরে আসে , খানিক আবছা হয়ে , আবার মিলিয়েও যায়। পুজো এলেই ফেরারি মন শৈশবে ফিরে যেতে চায় , ফিরে আসে সে আনন্দ মাখা সময়েরা আবারও । স্পষ্ট হতে থাকে ছোট প্যান্ডেল , মাইকের সুর , সব ভাইবোনের জন্য একই ছিটের জামা , তখনকার অতৃপ্তি এখন আর কষ্টে জারিত করে না । আমার পাড়ার দুর্গামন্দিরটি ছিল মুসলমান পাড়ায় , তখন হিন্দু মুসলিম চিনতাম না , জানতামও না। মন্দিরের সামনে ডানদিকে জয়নালদার বাড়ি , বড়দার বন্ধু , মোটা মতোন হাসিখুশি । জল-পিপাসা পেলে ওঁর বাড়িতে যেতাম । সেজদার বন্ধু হারুনদাকে পুজোর আয়োজনে দেখেছি। তখন পুজো-মহরমের প্রসেশনে পুলিশ থাকতো না , এখনকার মতো চাপের ছিল না । প্যান্ডেলে ভীড় সামলানোর পুলিশ ছিল না , পাড়ার বড়রাই পুলিশ ! বড় প্যান্ডেলে দাদা-দিদিদের বুকে রঙিন ব্যাজ থাকতো , ব্যাজ বুকে লাগানোর খুব ইচ্ছে হতো , বড়রা পাত্তাই দিতো না।

এই বড়বেলায় দেখছি , দু'বছর ধরে আনন্দের রাজ্যে ছায়া নেমেছে । মারি যেন পুজোর রঙ কেড়ে নিয়েছে , আনন্দ কেড়ে নিয়েছে । প্রতিমা তো উঠবে , আমরাও বেরোবো , মানুষের হাসি-মুখের আড়ালে অন্য ভাষা কেঁদে ওঠে , কাজ চলে যাওয়ার ভাষা , স্বজন হারানোর ভাষা , আপাত ভালো থাকার আড়ালে আঁকা বিপর্যয়ের অন্য ভাষা । রাস্তায় আলো থাকলেও মুখগুলোয় অন্ধকার । মণ্ডপগুলি আর মানুষের মনও খানিক কোলাহলহীন , যেন এক আলাদা বিসর্জন ! সাথে আছে আতঙ্ক , কী হয় কী হয় , বড়রা সজাগ , বিষয়টি চিন্তার তো অবশ্যই , ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ার সাবধানবানী , দ্বিতীয় ডোজের পরও আক্রান্ত হচ্ছে , মুখাবরণ আঁকড়ে ধরছে মানুষ ! এদিকে সন্দেহের বাতাবরণে বিশ্বাসের বিসর্জন । কার ফ্রিজে কোন মাংস আছে তার তল্লাশি , পোশাক দিয়েই শত্রু-মিত্র চিনছি , নাম দিয়েই আপন-পর চিনছি । তবে ভয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আগল ভেঙে অন্ধকার দূর করবে ছোটরা , ওরা উদ্দাম , বন্ধুত্ব আর মিলনের সুরেই ওরা বেয়ারা ! পুজোর মিলন তো ওদেরই । আজকের জয়নাল-হারুনদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে ছোটরা , হাতে ফুল আর মুখে মাস্ক নিয়েই , আবিলতাগুলির বিসর্জন দিতে ।

বিসর্জন শুনলেই তো সেই দশমীর সন্ধের কথা জেগে ওঠে। আলো ঝলমল মুখগুলি থমথমে , যেন আমিই কোনও গূঢ় অন্যায় করে ফেলেছি। ঠোটে সন্দেশ লেগে থাকলেও প্রতিমার মুখগুলোতে হাসি-তৃপ্তি নেই , খানিক কাঁপতে কাঁপতে মাটির প্রতিমাগুলি তিন চাকার ভ্যানে ওঠে , ধীরে ধীরে দূরে গিয়ে রাস্তার বাঁক নিলে ভালোবাসা অদৃশ্য হয় , মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাতাম বিদায়ের অভিমানে , আমার কবিতা-আঁকা মুখগুলোয় ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে , তারাও তাকায় অন্যদিকে । বন্ধন ছিঁড়তে থাকার কষ্ট মুচড়ে ওঠে। মার কথা মনে আসে । তখন তো খুবই ছোট , চলে যাওয়ার মানে বুঝতাম না , বড়দা বলেছিল---প্রদীপ নিভে যাওয়া । স্মৃতি বলতে , আধো স্বপ্নে কিছু স্থিরচিত্র । কান্নাকাটির অর্থ বুঝতাম না , একটি ঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছিলাম । সম্ভবত সেই অভিমান ! সম্পর্ক কি ছিন্ন হবেই ! আবছা অন্ধকার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় , নীরবতারা এগিয়ে আসে গুটিগুটি পায়ে !

মালতি

--কনিকা সরকার, আয়ারল্যান্ড

কলিং বেলটা বাজতেই বরুণ বাবু এসে দরজা খুললেন। "কিরে মালতি, এত দেরি করলি যে! তোর দিদিমণি কিন্তু খুব রেগে আছে। আজ আবার বেলা দশটা বাজিয়ে ফেললি কেন, হ্যাঁ?"
মালতি মৃদু স্বরে কি বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো। তখনই ভেতরের ঘর থেকে অপর্ণা বলে উঠলো "কিগো শুনছো, মালতীর এই মাসের টাকা মিটিয়ে দাও তো, আর ওকে বলে দাও - কাল থেকে ওকে আর আসতে হবে না।"
মালতি দৌড়ে ভেতরের ঘরে গেল অপর্ণা বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে।
এই দেখো দিদিমণি কান ধরছি আর কোনদিন দেরি হবে না সত্যি বলছি তুমি মিলিয়ে নিও।
বলতে বলতে মালতি অপর্ণা কে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। অপর্ণা জিজ্ঞেস করল "কিরে মিনু কোথায় ! আনিসনি কেন?"
দিদিমণি মিনুকে আমার বোনের বাড়িতে রেখে এসেছি সকালে, ওখানে বোনের ছেলে মেয়েদের সাথে কয়েক দিন থেকে আসুক।
অপর্ণা শুনে খুব উদাস হল, প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও মিনুর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। একসাথে খাওয়া দাওয়া করে। সেদিন মিনুর পছন্দের সব রান্না হয়।

খাবার টেবিলে বসেই অপর্ণা মালতিকে বলল - আজকে নিয়ে আসবি কিন্তু মিনু কে, স্কুল বন্ধ করা যাবে না। মালতি ভাবল, ওইটুকু মেয়ে মিনু একদিন স্কুল বন্ধ করলে কি এমন হবে! কিন্তু মুখে কিছু বলল না। দু'বার মিসক্যারেজের পর একটুতেই রেগে যায় অপর্ণা। কিছুদিন আগেই অপারেশন হয়েছে, তাই ওকে বেশি রাগানো ঠিক হবে না ভেবে মালতি শুধু বলল - আচ্ছা বাবা আচ্ছা! আজই নিয়ে আসবো, তুমি চিন্তা করোনা। সকালে ব্রেকফাস্টটাও ভালো করে খেলো না অপর্ণা।

ওদিকে মালতি কাজকর্ম সেরে সোজা বোনের বাড়ি চলে গেল। বোনের বাড়ি থেকে বোন না খাইয়ে ছাড়লো না। গল্প করে খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে একটু দেরী হয়ে গেল। দেরি দেখে মালতির বোন মালতিকে রাতটা থেকে সক্কাল সক্কাল যেতে বলল। মালতি বলল "নারে বাবা, যেতেই হবে, দিদিমণি সারাদিন কিছু খায় নি, খুব রেগে আছে, এখনই বেরিয়ে পড়ি আটটা চল্লিশের লোকাল টা পেয়ে যাব ঠিক। স্টেশন পৌঁছে দেখলো, ট্রেনটা কুড়ি মিনিট লেট। নটায় ট্রেনে উঠে ব্যারাকপুর থেকে মাঝেরহাট পৌঁছতে প্রায় রাত ১০:৩০ টা। স্টেশন চত্বর প্রায় জনমানবহীন বললেই চলে। দূরে হকার মোহন শুধু ওর ফাঁকা চায়ের কেটলি পাশে রেখে দুই হাতে খৈনি ঘষতে ঘষতে গুনগুন করছে। স্টেশনের বাইরে দু'চারটে রাস্তার কুকুর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

মালতি মিনুর হাতটা ধরে একরকম টানতে টানতে বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাইরেটা আজ একটু যেন বেশি অন্ধকার, তার ওপর অল্প অল্প শীত ঢুকেছে দেশে। পিচ রাস্তাটা পেরিয়ে গলির মুখে এসে মালতী থমকে গেল; মনে হলো কতগুলো পায়ের শব্দ ওর পিছু নিয়েছে।অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না, মালতি মিনুর হাতটা শক্ত করে ধরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। খানিকটা এগিয়ে কালী মন্দির, মালতি কিছু না বুঝতে পেরে মোড়ের কালী মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো । মন্দির এত রাতে পুরো ফাঁকা, তবে আধপোড়া নারকেলের ছোবড়া ও ধুনোর গন্ধ অনুভব করা যায়। মালতি মিনুকে 'মা'য়ের কাঠামোর পিছনে চুপ করে বসতে বলে, মন্দিরের পাশে পড়ে থাকা একটা বাঁশ হাতে তুলে নিল, মিনু কে বুঝিয়ে বলল - যাই হয়ে যাক, তুই বাইরে বেরোবি না, আমি এসে না ডাকলে, কেমন? লক্ষ্মী মা আমার, মিনুর কপালে আলতো করে একটা হামি খেলো।

মালতির পিছুপিছু চারটে মাঝ বয়সী যুবক মদ্যপ অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে দৌড়ে ঢুকলো মন্দিরে। মালতি কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন হামলে পড়ল মালতির ওপর। বাকিদের সেকি উল্লাস, কি বিকট হাসি। মালতি হাতের বাঁশটা দিয়ে জোরে আঘাত করল ছেলেটার পেটে, পিঠে; কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। ততক্ষণে বাকিরাও হামলে পড়েছে, নৃশংস হায়নার মতো তাদের চাহনি। মালতি কোনরকমে নিজের শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে তাদের একজনের মাথায় আঘাত করল জোরে, ছেলেটা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তখনই আরেকটা ছেলে জোর করে মালতির হাত থেকে বাঁশ ছিনিয়ে নিতে গিয়ে আঘাত করে বসল মালতির মাথায়। মাথার পিছন থেকে স্রোতের মতো রক্তগঙ্গা বইছে। ছেলেগুলো তখন দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ভয়ে দৌড়ে পালালো, দৌড় দৌড় দৌড়.....

সন্ধ্যে সাতটার সময় মালতির জ্ঞান ফিরল হাসপাতালের ঘরে। আধো বন্ধ আধ খোলা চোখে আবছা দেখতে পেল দাদাবাবু আর দিদিমণিকে। অপর্ণা মালতির হাতে হাল্কা করে চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করলো। মালতি কোনরকম বলল - মি.... মিনু...। মিনু ভালো আছে, ভয় পেয়েছে একটু, তুই চিন্তা করিস না, শান্ত হ। মালতি অনেক কষ্টে ধরা গলায় কোনরকমে বলল - "দিদিমণি... আমার মিনুকে তোমরা দেখো.... মিনু তোমার....." হসপিটালের সেই ঘরে সেদিন আর কোন কথা হল না, শুধুমাত্র অপর্ণার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল মালতির কপাল স্পর্শ করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলো.....।

যখন ভাঙল অভিমান

--পারমিতা চ্যাটার্জী, ভারত

আজ অফিসে খুবই অন্যমনস্ক লাগছিল রঞ্জন কে -- কেন এত খোলামেলা মানুষটা আজ হঠাত এত গম্ভীর কেউ বুঝতে পারছেনা। রঞ্জন উচ্চপদস্থ হলেও ও সহকর্মীদের সাথে খুব সহজ সম্পর্ক রাখে। তাই ওর এই ভাবান্তর সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।
রঞ্জন নিজেও বুঝতে পারছেনা কি হল তপুর কাল থেকে? অফিসে আসার সময় তো বেশ হাসিখুশি ছিল-- তাহলে? কাল কি একটু দেরীতে ফিরেছিল বলে? কিন্তু ওরকম দেরী তো ও মাঝে মাঝেই করে-- তপুকেও নিয়ে যেতে চায় একটু বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া এই আর কি? কাল সারাদিন অফিসের খুব প্রেসার ছিল, তাই একটু গিয়েছিল-- তাছাড়া তপুকে তো ফোন করে বলেও দিল-- তাহলে এরকম ব্যবহারের কারণ কি? কাল থেকে একবারও ওর সাথে ভালো করে কথা বলছেনা -- রাতে শোবার সময় রঞ্জন ওর কাছে যখন এলো তখন ও ছিটকে সরে গিয়ে বলল-- আমি খুব ক্লান্ত, সবসময় তোমার হুকুম তামিল করতে পারবনা-- হুকুম? রঞ্জন অবাক হয়ে গেল-- আজ অবধি তো সে কোনদিন হুকুম করেনি তপুকে-- কখনও ওকে কেনদিন কোন ব্যপারে জোর করেনি-- তপুও অবশ্য খুব সুন্দর ভাবে সংসারটাকে ভরিয়ে রাখে -- নিজের বাবা মায়ের মতন রঞ্জনের বাবা মায়ের সাথে একইরকম ব্যবহার করে-- ও বাড়ী থেকে ফোন এলে রিমিকে কাজের মাসীর কাছে রেখেও ও ছুটে চলে যায় -- খুবই কর্তব্য পরায়ণ -- সে দিক থেকে রন্জনের কোন অভিযোগ নেই- নিজের জন্যে কিছু কিনতেও চায়না-- রঞ্জন জোর করে ওর জন্য শাড়ি বা কুর্তি পছন্দ করে কিনে আনে-- সেটা অবশ্য খুবই মাঝে মাঝে-- সে অত ভেবে কোন কাজ করতে পারেনা, পেশায় ইন্জিনিয়ার হলেও সে একজন স্বভাব কবি -- অনেকসময় অনেকরাত অবধি সে লিখে যায় একমনে -- তপু তাকে একটুও বিরক্ত না করে চুপ করে এক কাপ কফি রাখে টেবিলে-- রঞ্জন মুখে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ হাসি-- বলে আমি এখনি আসছি-- তপু কাছে এসে ওর মাথার চুলটা এলেমেলো করে দিয়ে বলে -- না না তুমি লেখ -- রঞ্জন ওর বুকে নিজের ক্লান্ত মাথাটা রেখে এক পরম শান্তি পায়।
মাঝে মাঝে অবশ্য ওর এরকম ভাবান্তর হয়, তখন রঞ্জন কাছে এসে বলে, কি হয়েছে আমায় বল? তুমি তো জানো তোমার গম্ভীর মুখ আমি একদম সহ্য করতে পারিনা-- তপুর মুখে ফুটে ওঠে হালকা হাসির রেখা -- বারে! আমার বুঝি মেজাজ মন কিছু খারাপ হতে নেই? রঞ্জন ওকে বুকে চেপে ধরে যেই বলে -- না হতে নেই-- ব্যস অমনি অভিমান গলে জল।
আজ কি হল? সকালেও রঞ্জনের সাথে কথা বললো না-- একবারও কাছে এলোনা। তপু তো নিজেই বলে রিমি আসতে আসতে বড় হচ্ছে তুমি যাও আমি ওকে একটু পড়াবো-- তাইতো কাল আর ও নতুন করে ওকে জিজ্ঞেস করেনি। বাড়ীর এই গুমোট পরিবেশ তার মনের ওপর বেশ চাপ ফেলে দিয়েছে।
হঠাত ফোনটা বেজে উঠল-- তপুর নাম্বার দেখে ও খুশি হয়ে ফোনটা রিসিভ করল-- ও পাস থেকে কচি গলায় ভেসে এলো রিমির গলা-- বাবাই?
- হ্যাঁ মা বল?
-- কাল তুমি খুব অন্যায় করেছিলে?
-- কি করেছিলাম মা?
-- তুমি কোনদিন মাম্মামের জন্মদিন মনে রাখোনা-- কাল আমি তোমায় আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম চুপিচুপি-- তুমি মাম্মামকে হেসে বলে এলে আজ বিকেলে কিন্তু একটা সারপ্রাইজ আছে-- সুন্দর করে সেজে তুমি আর রিমি রেডি থেকো আমি তোমাদের নিয়ে এক জায়গায় যাবো-- মাম্মাম কি খুশি হয়েছিল জানো বাবাই-- আমায় বলল, এবার তোর বাবাইয়ের আমার জন্মদিনটা মনে আছে-- আমায় তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক করিয়ে নিল-- তারপর নিজে কি সুন্দর করে সাজল-- আমায় বলল-- তোর বাবাই আমাকে এই শাড়িটা এনে দিয়ে বলেছিল আমায় নাকি গোলাপি রঙে খুব মানায়-- এই শাড়িটাই পরি কি বল? আমিও হেসে বললাম খুব সুন্দর লাগছে তোমায় মাম্মাম-- রঞ্জন অবাক হয়ে শুনছিল মেয়ের কথা -- কি করে সে ভুলে গেল?
-- তারপর কি হল রে? তুমি যেই ফোন করলে মাম্মাম ভিষণ কাঁদল তারপর শাড়ি টারি সব খুলে দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল।
তারপর তো আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পরেছিলাম। আজ স্কুল থেকে এসে দেখি মাম্মামের চোখটা লাল আর চোখে জল।
-- ঠিক আছে মা সত্যি আমার খুব ভুল হয়ে গেছে-- আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী আসছি।
রঞ্জন ফোনটা রেখে ভাবল-- যে মেয়েটা কখনও তার কাছে কিছু দাবী করেনা, নীরবে সব কর্তব্য করে যায় -- এমন কি বিয়ের তারিখটাও তার মনে থাকেনা কোনদিন-- তপুই প্রত্যেকবার তাকে গিফ্ট কিনে সারপ্রাইজ দেয়-- রঞ্জন বলে একটু তো সকাল বেলা বলতে পারতে?
-- কেন বলবো? বিয়ে কি আমি একা করেছিলাম? তাকে কাল বলে এসেও ভুলে গেল- বেচারা সেজেগুজে কত উচ্ছল ছিল, আর সে একটা দিনও তার খুশির দাম দিতে পারলনা-- অভিমান তো হবেই -- অভিমানটাই স্বাভাবিক আর এই অভিমান তাকেই ভাঙাতে হবে।
সময় দেখল এখন তিনটে বাজে-- সে তার এসিসটেন্ট প্রীতমকে ডাকল-- আমায় একটু বাড়ী যেতে হবে এখুনি --বাড়ী থেকে ফোন এসেছিল--ও আচ্ছা স্যর আপনি যান আমরা সামলিয়ে নেব।
রন্জন আর কথা না বাড়িয়ে সোজা গাড়ী নিয়ে নিউমার্কেট সেখান থেকে তপুর পছন্দ মতন কেক, মাফিন, শাড়ি তার সাথে ম্যাচ করে কস্টিউম জুয়েলারির সেট-- নানান রকম ফুলের স্তবক নিয়ে ছুটল বাড়ীর দিকে--
দরজা খুলে এইসময় রঞ্জন কে দেখে তো তপু অবাক-- আরও অবাক তার দুহাত ভর্তি জিনিসপত্র দেখে।
রঞ্জন দেখল তপুর চোখ মুখ তখনও ফোলা-- রিমি ঘুমোচ্ছে -- রঞ্জনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তপুকে এভাবে কষ্ট পেতে সে কখনও দেখেনি।
রঞ্জন জিনিসপত্র খাটের একধারে রেখে এসে সোজা তপুকে কোলে তুলে নিয়ে এসে খাটে বসিয়ে দিল-- তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গভীর চুম্বনে তার ঠোঁট ডুবিয়ে দিল -- তারপর যখন মুখ তুললো-- দেখলো রঞ্জনের চোখের কোলেও জল-- তপু নিজের কথা ভুলে গিয়ে রঞ্জন কে বলল-- তুমি কাঁদছ কেন?
আমার মতন একটা অপদার্থ স্বামীর সাথে তুমি কি করে থাকো তপু? কাল একটা দিন তেমায় কথা দিয়ে আমি ভুলে গেলাম-- তোমায় এতো কষ্ট পেতে আমি কোনদিন দেখিনি-- আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে বিশ্বাস কর-- তপু তখন হাসিমুখে রঞ্জনের কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল-- বউয়ের কষ্টে এমন কষ্ট কজন পায়? কে বলে তুমি অপদার্থ?
তুমিতো জানোই আমি অগোছালো এলোমেলো এই অগোছালো আমিটাকেই তো তুমি ভালেবাসো-- তবে কেন এতো রাগ করলে বল? কাল থেকে আমার কি যে অবস্থা হয়েছিল সে শুধু আমিই জানি--
তপু ওকে আরও ওকে গভীর ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বলল--- আরে আমিও তো মানুষ -- মাঝে মাঝে তো আমারও অভিমান হতে পারে তাইনা?
-- হ্যাঁ পারেই তো -- নিশ্চই পারো-- কিন্তু এখন আর কোন অভিমান নেই তো--?
-- আর একদম কিছু নেই সব অভিমান তুমি ধুয়ে দিয়েছ--
-- তোমার জন্য আমি কিছু উপহার এনেছি একটু দেখো না-- তোমার পছন্দ হয়েছে কি না?
তোমার আনা উপহার আমার কোনদিন অপছন্দ হয়েছে?
রঞ্জন তপুকে জড়িয়ে ধরে বলল- -- আর আমাকে?
-- তোমাকে? একটুও না-- বলে তপু যেই রঞ্জনের মুখের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলো তখন দরজার ফাঁক দিয়ে রিমি বেড়িয়ে এসে বলল-- কি মজা বাবাই আর মাম্মামের আবার ভাব হয়ে গেছে---
এবার দুজনেই হো হো করে হেসে উঠে বলল -- দেখেছ দুষ্টুটার কাণ্ড--।।

প্রথম হিমালয়-ফিরে দেখা

--ঋদ্ধিমান ভট্টাচার্য্য, ভারত

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে জেঠুর কাছে বসে ইংরেজি পড়ছি। জেঠু বলল, এবার গরমের ছুটিতে মদমহেশ্বর যাবো, সবাই মিলে। টেস্ট পেপার বন্ধ করে, জুলজুল করে তাকালাম। জেঠুর ঠোঁটের কোনে হাসি- গল্প একটা নয়, একের পর এক গল্প আছে। তাই এখন না। অগত্যা, আবার খাতার পাতায় চোখ নামালাম, মন যে নামলো না, সেটা জেঠুও বুঝেছিল। তাই বলল-রাতে খাওয়ার টেবিলে গল্পটা বলব। এখন চটপট শেষ কর।

রাতে মুসুরির ডালের সাথে, জেঠুর বরাবরের ফেভারিট আলুপোস্ত মেখে মুখে তুলে জেঠু শুরু করল।

-এবার তোর প্রথম ট্রেকটা হোক। মে মাসে ঠিক করেছি সবাই মিলে মদমহেশ্বর যাবো। মদমহেশ্বরের গল্পটা জানিস তো?
ঘাড় নাড়লাম।
জেঠু বলল- পঞ্চ কেদারের নাম শুনেছিস? এটা দ্বিতীয় কেদার।

আমার কাছে তখন হিমালয় মানেই তো গায়ে গতরে বাড়তে থাকা একটা ভঙ্গিল পাহাড়। বরফে ঢাকা সব পাহাড় চুড়ো। আর কেদার মানেই তো সেই হিমালয়। সেটাই তো ম্যাজিক। তবে বুঝতে পারছিলাম, এই ম্যাজিকের বাইরেও অজানা কিছু গল্প আছে। সেদিনই প্রথম শুনেছিলাম, সেইসব গল্প- জেঠুর থেকে। পরে বুঝেছি, সীমার মাঝে অসীম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই হিমালয়ের প্রতিটি পাথরে পাথরে লেপটে আছে ইতিহাস আর পুরাণ।

জুন মাসের কোলকাতা তখন দরদর করে ঘামছে। হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেস ছাড়ল। মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক ট্যুর , বাবা-জেঠু-কাকা-মা-কাকি'-জেঠি-ভাই সব্বাই মিলে। ক্যাপ্টেন জেঠু, যিনি হিমালয়টা প্রায় চষে ফেলেছেন। গাড়োয়াল হিমালয়ের অলিতে গলিতে ততদিনে আমার জেঠু "প্রিনসিপ্যালজি" নামে পরিচয় তৈরি করে ফেলেছেন।আর আমিও ততদিনে জেনে গেছি পঞ্চ কেদারের গল্পটা।

মহাভারতের যুদ্ধের পর, পঞ্চপান্ডব চাইলেন স্বর্গারোহণে যাবেন। আর হিমালয় যেহেতু দেবাদিদেবের আবাস, তাই তাঁর পারমিশনটা নিতেই হয়। এদিকে মহাদেব নারাজ। যারা যুদ্ধে নিজের ভাই, পরিজনকে হত্যা করেছে, তাদের তিনি সাক্ষাৎ দেবেন না। মহাদেব পালিয়ে বেড়ান । লুকিয়ে থাকেন। ছদ্মবেশে থাকেন। এদিকে পাঁচ ভাই খুঁজেই চলেছেন। অবশেষে গুপ্তকাশীর কাছে মহিষের ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়ানো মহাদেবকে চিনে ফেললেন পান্ডবেরা। যেইনা জড়িয়ে ধরতে যাবেন, ওমনি শিব পাতালে সিঁধোলেন। মধ্যম পান্ডব জাপটে ধরলেন মহিষরূপী শিবের পশ্চাৎদেশ। এরপর মানভঞ্জন হল, পুজো হল। শিব সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে পাঁচ ভাই, হিমালয়ের পাঁচটি স্থানে সেই মহিষের শরীরের পাঁচটি অঙ্গ স্থাপন করলেন। সেই হল পাঁচটি কেদার। পঞ্চকেদার গুলি হল কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, কল্পেশ্বর, রুদ্রনাথ আর তুঙ্গনাথ।

পুরাণ ছেড়ে আবার পথে নামি। ট্রেন জার্নিটা সেই সময় সত্যিই অন্যরকম ছিল। ঘাড় ঘুড়িয়ে সেসব খুঁটিনাটি সব বলতে গেলে নস্টালজিয়া রোগটা জেঁকে বসবে, তাতে বিস্তর ঘাড় ব্যথা হবে। এছাড়া দুই যুগ আগের স্লিপার ক্লাসে গরম কালে বেড়াতে যাওয়া মানে, জানলায় ভিজে গামছা বেঁধে রাখা, বড় স্টেশন আসলেই ঝপাঝপ খাওয়ার জল বোতলে ভরে তাতে জিওলিন দেওয়া, দুই বার্থের মাঝে রাত বিরেতে অনাহুত সহযাত্রীর শুয়ে পড়া, প্যান্ট্রির বিচ্ছিরি ডিমের ঝোল, চিকেন কারি দেখে নাক সিঁটকানো -এসব পরপর ঘটতেই থাকে। আর ঘটনার শেষে যখন ট্রেনটা হরিদ্বার স্টেশনে এসে পৌঁছায়, মনে হয় যেন কোন সাংঘাতিক মেলোড্রামা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কোথাও যেন লেখা রইল -টু বি কন্টিনিউড। এর পর, কাট টু - জেঠু। অ্যাকশন।

হরিদ্বারে নেমেই আবার গল্পের প্রোটাগনিস্ট আমার জেঠু। আমরা তিন ভাই, জেঠুর তিন ভাইপো হলাম ল্যাঙবোট। জেঠুর সথে সফর মানে , নো পজ বাটন, ওনলি প্লে। হরিদ্বারে এসে বড়জোর একটা রাত্তির । সন্ধ্যে বেলাতেই বিশ্বস্ত বিক্রান্ত ট্রাভেলস থেকে গাড়ি বুক। এই সাথে ট্রাভেল থিলারে একটু কমিক রিলিফ যোগ করে রাখলাম। ঘটনাটা পরের দিনের। আক্রান্ত স্বয়ং আমি। ভোরে তখনও ঘুম ভাঙেনি। আধবোজা চোখের চিলতে ফাঁক দিয়ে , হাফ সার্কুরাল ভিশনে দেখলাম , রোদ আসছে বিছানায় আর আর আমার বুকের উপর উঠে বসে আছেন একটা বেবুন। পাশে বাবা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বেবুনের মতি বুঝে নেবো, এমন কেউকেটা মোটেই আমি না। তাই ভয় পাওয়াটাই অনিবার্য রিফ্লেক্স ছিল। রীতিমতো আর্তনাদ করে আশপাশের সবাইকেই জাগিয়ে তুললাম। বেবুনটিও ভয় পেয়ে ঘরের মধ্যে আগুন ছাড়া লঙ্কা কান্ড ঘটালো। বেবুনের মহা নিষ্ক্রমণের পর, বলাই বাহুল্য, আমায় বিস্তর টিটকিরি করা হল। কেউ একবারেও মনযোগ দিল না যে হোটেলের ঘরের কাঁচের জানলার কাঁচটাই ছিল না।

সেই বৃতান্ত তোলা থাক। বরং টুক করে পৌঁছে যাই উখিমঠ। আমার প্রথমবার, হিমালয়কে এত কাছ থেকে দেখা। যাত্রাপথে একরাত কাটিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগে। জেঠু চিনিয়ে দিয়েছিল পান্না সবুজ নদীটির নাম মন্দাকিনী। আর চন্দনবর্না যে, সে অলকানন্দা। দুজনের র‍্যাদেভুঁ দেখতে নামতে হয়েছিল অনেক গুলো সিঁড়ি। অলকানন্দা যেন ফুঁসছে আর নিরাপদে নিশ্চিন্তে নিজেকে সেই জেহাদে সমর্পণ করছে মন্দাকিনী। সন্ধ্যা অবধি বসেছিলাম সেই প্রয়াগে। জলের শব্দ শুনেছি। হিমালয়ের সোহাগী বাতাস ছুঁয়ে গেছে বারবার। আর জেঠু বলেছিল জিম করবেটের গল্প, রুদ্র প্রয়াগের সেই চিতাবাঘের গল্প।আর পরেরদিন যখন উখিমঠ পৌঁছলাম, মনে হল যেন শুন্ডি রাজ্য। মৈঠানিদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘরোয়া ব্যবস্থা। ওগুলোই এখন আমরা হোমস্টে বলি। তখন ওসব শব্দ শুনিই নি। মৈঠানিদের বাড়ির ছাদটায় দাঁড়ালে, দূর অবধি পাহাড় দেখা যেত। নীল আকাশ ফুঁড়ে উঁকি দিত পাহাড় চুড়ো। ওদের বাগানে একটা আখরোটের গাছ ছিল। রাতে বাড়ির আশপাশ দিয়ে নেকড়ের দল ছুটে যেত। আর তাগড়াই সব কুকুর গুলো, তাদের তাড়িয়ে বেড়াতো। মদমহেশ্বর রওনা হবার আগের দিন জেঠু আবার গল্পের ঝুলি খুলে বসল।

পুরাণ অনুসারে, ঊষা ছিলেন অসুর রাজা বাণাসুরের মেয়ে। বাণাসুর ছিলন শিবভক্ত এবং বাবার মত ঊষাও শিব ও পার্বতীর ভক্ত ছিল। শিব-পার্বতীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত দেখে ফেলায় ঊষার মন চঞ্চল হয়। ভক্তের মনের বাসনা বুঝে পার্বতী ঊষাকে বর দিয়েছিলেন যে "বৈশাখ মাসে একজন ব্যক্তি তোমার স্বপ্নে হাজির হবেন এবং তিনি হবেন তোমার স্বামী।"
ঠিক সেই মতন, স্বপ্নে এক যুবক রাজকুমারকে দেখে ঊষা তার প্রেমে পড়ে গেলেন। সেই রাজপুত্র ছিলেন আবার শ্রীকৃষ্ণের নাতি তথা প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। ঊষার বান্ধবী, চিত্রলেখা, নারদের সাহায্যে এবং নিজের অতিপ্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা থেকে অপহরণ করে ঊষার কাছে নিয়ে আসেন।এটি জানতে পেরে কৃষ্ণ একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এসে বাণাসুরের রাজ্য শোণিতপুর আক্রমণ করেন। বাণও কৃষ্ণের সেনাবাহিনীকে সমান শক্তিতে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণের সামনে শক্তিহীন বোধ করতে শুরু করেন। এরপর সে শিবকে তার পক্ষ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। শিব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কারণ তিনি বাণাসুরকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ নিজে শিবকে এমন অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন যা শিবকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এই সুযোগে কৃষ্ণ বাণাসুরকে জব্দ করে ফেলেন। যেই মাত্র কৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের নিক্ষেপ করে বাণের মাথা বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হলেন শিব নিদ্রা থেকে উঠে, কৃষ্ণের সাথে বৈঠকে বসলেন। যুদ্ধ মিটলো। যুদ্ধের পরে ঊষা অনিরুদ্ধকে বিয়ে করেছিল। এই যে এত ঘটার বিয়ে, সেটা হয়েছিল এইখানেই। তাই এই জায়গার নাম হয়েছিল ঊষামঠ, তা পরে লোকমুখে পালটে উখিমঠ।

পূরাণ পথ ছেড়ে আবার সড়ক পথে আসি। গাড়ির মালিকের নাম ছিল শিশুপাল। আধাঘন্টার রাইড শেষে পৌঁছে গিয়েছিলাম যোগাসু। যোগাসুতে এসে নদী পেরিয়ে শুরু হয়েছিল আমার প্রথম ট্রেকিং। কখনো হাঁটা, কখনো পাকদন্ডী বেয়ে হাতড়ে উঠা। এভাবেই ঘন্টা খানেক হেঁটে যেখানে পৌঁছালাম, সেই জায়গাটির নাম লেঙ্খ।পাহাড়ের উপর ধাপে ধাপে ফলে আছে সোনার বরণ গেঁহু। আমরা বসলাম পোস্ট আফিসের চাতালে। লালরঙের ডাকবাক্সটাকে দেখেই বুঝেছিলাম, সে বেচারার মন খারাপ। প্রেমের চিঠি তো বড় একটা আসেনা। বড়জোর মানিওর্ডার আসে। শহরে কাজ করা ছেলে, বাপ-মা-বৌয়ের জন্য মাসের খরচ পাঠায়। পোস্ট আফিসের পাশেই পঞ্চায়েতের অফিস আর একটা ছোট চায়ের দোকান। তাই ম্যান্ডেটরি টি ব্রেকটা নিয়েই নিলাম।

আবার হাঁটা। দুপাশে সরলবর্গীয় সব গাছ। আদিম মহাদ্রুমের ফাঁক- ফোঁকড় গলে, নীল আকাশ, পাহাড়ের উঠানামা চোখে পড়বে খালি। কত সব পাখি ডেকে চলেছে। জেঠু জানিয়ে দিল, দুপুরের লাঞ্চ ব্রেক রাঁশিতে। কপাল ভালো থাকলে ওখান থেকেই দেখতে পাবো চৌখাম্বা। কিন্তু কপালে মেঘ লেখা ছিল। হা-পিত্যেশ করে বসে থেকেও চৌখাম্বার দেখা পেলাম না।তবে যে লজের বারান্দায় বসে দুপুরের খিচুড়ি আর পাঁপড় সেঁকা খেয়েছিলাম সেটির নাম ছিল ""চৌখাম্বা"। রাঁশিতে একটা মন্দির আছে, রাকেশ্বরীর মন্দির। একটা উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালের একপাশে চিলতে একটু সমতলে সেই মন্দির। মন্দিরের গায়ে ছোট ছোট কুলুঙ্গি। আর তাতে ছোটছোট নানা দেবদেবীর মূর্তি। হিমালয়ের পাহাড়ি গ্রামগুলোর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখলাম। জোয়ান ছেলেরাও বসে বসে তাস খেলে, গুলতানি করে। আর মেয়েগুলো, পাথর ভাঙছে, চাষ করছে, কাঠ কেটে আনছে। এখানেও তেমন। খেতে বসে জেঠুকে ধরলাম -এই রাকেশ্বরী কে ?

ভ্যানভ্যানে মাছি হাত দিয়ে উড়িয়ে জেঠু বলতে শুরু করল -রাকা মানে পূর্ণিমা। বহুকাল আগে, এই পাহাড়ি উপত্যকায় কোন এক চাঁদ কুড়ানো মাঝরাতে নিরাভরন দেবকন্যারা শরীরে আলো মাখছিলেন। আর সেই দৃশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। (এতে চাঁদের অপরাধ কি, আমার মগজে ঢোকেনি) আর তাই অভিশপ্ত হলেন চাঁদ। তবে পূরাণে যেমন অভিশাপের বাড়াবাড়ি ছিল, তেমন তার থেকে পরিত্রাণের উপায়ও ছিল। অনেকটা রোগ আর রোগের উপশমের মতন। সেই মতন, চাঁদ শিবের উপদেশ মেয়ে দূর্গাকে আরাধনা করে শাপমুক্ত হলেন। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন দেবী দুর্গার মন্দির। পূর্ণিমায় পূজিতা দুর্গার নাম সেখানে রাকেশ্বরী। আর সেই থেকেই এই গ্রামের নাম রাঁশি।

তখন প্রায় বিকেল চারটে। আমরা এসে পৌঁছলাম গৌন্ডার। আজকের মতন ট্রেকিং শেষ। কমবেশী প্রায় ১৩ কিলোমিটার পথ আবার হাঁটতে হবে কাল। গন্তব্য মদমহেশ্বর। আজ সকালে সেই যে হাঁটা শুরু হয়েছিল যোগাসু থেকে। সে কেবল হাঁটা তো নয়, হামাগুড়ি, হাচোড়পাঁচড় সব মিলিয়ে সে এক নাভিশ্বাস কান্ড। আদিম যত মহাদ্রুম রোদ্দুর আড়াল করে রাখলেও, ঘেমে নেয়ে একশা হওয়ার দশা। পাও হড়কেছে কয়েকবার। রডোডেনড্রনের লালিমা,ফ্লাইক্যাচারের কিচিরমিচির আর জেহাদি নদীর বয়ে চলা দেখে যে কাব্য করব তার জো ছিল না। ট্রেকিংএর বিধিসম্মত সতর্কীকরণ মেনে নিয়ে রসনা সুখও ভাসিয়ে দিয়েছি নদীজলে। রাঁশিতে দুপুরের মেনু ছিল খিচুড়ি সে তো আগেই বললাম। সে বর্ণে খাদ্যসদৃশ হলেও তার স্বাদ লালমোহন বাবুর ভাষায় হাইলি সাশপিশিয়াস। তার সবটুকুই পাকস্থলীতে জারিত হয়েগেছে। গৌন্ডারে এসেই ঘর মিলে গেল। গৃহস্বামী রমেশ পাওয়ার।কাঠের দোতলা। রুকস্যাক থেকে কাজুবাদাম,চকলেট বেরকরে বারান্দায় বসলাম। রমেশজি এনে হাজির করলেন পরম ইপ্সিত চা। জুন মাসে এমনিতেই সন্ধ্যা নামে অনেক দেরিতে। তবে সারাদিনের লুকোচুরির পর অবশেষে রমেশ পাওয়ারের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখলাম পড়ন্ত রোদে চিকচিক করা চৌখাম্বার চুড়ো। এরপর সন্ধ্যা নামলো। পাইনের বনে শুরু হয়ে গেল ঝিঁঝিঁপোকার সিম্ফোনী। রমেশজি আবার এলেন দেখলেন আর জয় করলেন আমাদের মন। বললেন রাতে ভেড়ার মাংস আর রুটি। হুল্লোড় চলছিল ভেতর ঘরে। আর অপেক্ষা পাকামেষের। অবশেষে এল মাহেন্দ্রক্ষন। টের পেলাম ধোঁয়া ওঠা মাংসের ঝোলের রোমান্টিকতা মদমহেশ্বর গঙ্গার বয়ে চলার থেকে একটুও কম নয়। সব্বাই হামলে পড়লাম।

রাতে ঘুম হয়েছিল জব্বর। জেঠুর কাছে গল্প শুনেছিলাম, বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথের হারিয়ে যাওয়া পূরাণ পথের সন্ধানে বেরিয়ে কিভাবে একদল অভিযাত্রী হাজির হয়েছিল এই গৌন্ডার ভ্যালিতে।১৯৩৪ সালের কথা। এরিক শিপটন এবং টিলম্যান নামের দুজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী বদ্রীনাথ থেকে কেদারনাথ আসার জন্য শতোপন্থ গ্লেসিয়ার ধরে চলতে শুরু করেন।প্রায় দু'সপ্তাহের এই অভিযান শেষে তাঁরা এসে পৌঁছান এই মদমহেশ্বর ভ্যালিতে, গৌন্ডার গ্রামে। বারান্দায় বসে আমরা যখন সেই গল্প গোগ্রাসে গিলছি, চাঁদের রুপোলী আলো মেখে আমাদের অজান্তে কত সব রহস্যের জাল বুনেছিল পাহাড়-বন আর নদী , সেসবের খোঁজ আমরা রাখিনি।

পরের দিন ঘুম ভাঙালো পরভীন। কথায় কথায় পরভীনের সাথেই আপনাদের আলাপ করানো হয়নি। উখিমঠের মৈঠানিদের বাড়ির ছোট ছেলে পরভিন। দেখতে ঠিক গ্রিক মিথোলজির রাজপুত্তুর টাইপ। মাথা ভর্তি লম্বা চুল। আর ওর ভালো চুলের গোড়ার কথা হল, ওর চুলের জন্য যত্ন। উখিমঠ থেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছে, গাইড হয়ে। চুলের জন্য যত্ন প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়েছে। সকাল সকাল আমাদের ডেকে দিয়েই নিজে চলল, ঝরনার দিকে। আমারাও পিছু নিয়েছিলাম। ওমন কনকনে ঠান্ডা জলে, দিব্বি মাথা ধুয়ে, শ্যাম্পু করে নিল পরভীন। আমরা অবাক হওয়ায় বলেছিল - রোজ চুলে শ্যাম্পু না করলে চুল খরাপ হয়ে যাবে। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, ও ঠিক একদিন বাড়ি থেকে পালাবে, বলিউডে নায়ক হতে।

সকাল সকাল শুরু হয় হাঁটা। আর পাঁচটা ট্রেকিং এর মতন সেই সমানে চড়াই ভাঙা। বহু নীচ দিয়ে বয়ে যায় মদমহেশ্বর গঙ্গা। পাইন-চিরের পাতায় রোদ কুচিকুচি হয়ে ছড়িয়ে যায় বোল্ডার বিছানো পথে। পাখি ডাকে। বুনো ফুলের গন্ধ ভাসে। হিমালয়কে নিজের সাথে নিয়ে, এইভাবে চলা যায়- সেই প্রথম অনুভব করেছিলাম। কিশোর বয়সের ছটফটানি তো ছিলই, তার পথের শেষে কোথায় পৌঁছাবো, কি দেখবো, কতটা হাঁটবো, কিছুই মাথায় রাখিনি। আজ এতবছর পরে লিখতে বসে, তাই বিশুদ্ধ ট্রেকার বা ট্যুরিস্টের মতন ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার দিতেই পাচ্ছি না। খালি সেই মোহ, সেই অধরা মাধুরীকে কাছ থেকে দেখার উত্তেজনাই ভীড় করছে অক্ষর হয়ে, শব্দ হয়ে। মনে আছে দুপুর অবধি হাঁটার পর নানুতে এসে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম। পাহাড়ি পথের পাশে, একটা ছোট্ট ঘর। যারা উপত্যকায় ভেড়া চরাতে আসে, তারা থাকে। বাইরে কাটের পাতাতন পেতে বেঞ্চি বানানো। ঘরের ভেতরে একটা তক্তপোষ, কম্বল বিছানো। ঘরের কেয়ারটেয়ার বলতে একটি বছর ছয়- সাতের ছেলে। দেখতে রাশিয়ান গল্পের বইয়ের, গাল লাল বাচ্চা গুলোর মতন। সাথে আছে কয়েকটা কালো লোম-ওয়ালা কুকুর। আমরা পৌঁছাতে, ছেলেটি ছুটে গিয়ে তার নানিকে ডেকে আনল। আর সেই নানি'স কিচেনে সেদিন দুপুরে অড়হর ডালের খিচুড়ি খেয়ে ঘন্টা খানেক ঝিমিয়ে নিয়েছিলাম ওই বোঁটকা কম্বলের বিছানায়।

এরপরের পথটুকু যেন আরো চড়াই। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। দিনের বেলাতেই ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছিল, অনবরত।বোল্ডারের সাথে পায়ের আপোষ হচ্ছিল কিছুতেই। অথচ পরভীন দেখি , মাঠে মর্নিং ওয়াকের মতন অনায়াস হাঁটছে। মনে হচ্ছিল ওর পায়ের তলায় নিশ্চিত খুর আছে। এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ খেয়াল হল, আলো কমে আসছে। না, বেলা ফুরায়নি, আকাশে মেঘ জমছে। প্রথম ধাক্কার জোলো হাওয়ায় ঘাম শুকালো, তারপর কাঁপন ধরালো। বৃষ্টি নামল হুড়মুড় করে। আর প্রত্যাশা মতন কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়তে থাকলো। একটা চ্যাটালো পাথরের তলায় বেশ কিছুক্ষণ আশ্রয় নিলাম, কিন্তু দুর্যোগ থামার নাম নেই। অগত্যা সেই বৃষ্টি আর বরফের কুচি মেখেই আবার চলা শুরু হল। পরভীন বলেছিল তখনো প্রায় দু'কিলোমিটার বাকি, মদমহেশ্বর পৌঁছাতে।

যখন বৃষ্টি ধরল, তখন সারা বনপথ জুড়ে কেমন এক মন মাতানো গন্ধ। বুদ্ধদেব গুহ লিখেছিলেন বসন্তে নাকি বনের ভেতর একটা গন্ধ হয়-ফিরদৌস আতরের গন্ধ। আমি বসন্তের বন দেখিনি, ফিরদৌস আতরের গন্ধ কেমন তাও জানিনা। তবে পাতা টুপিয়ে জল পড়া, পথের ধারে জমে থাকা বরফের কুচির সাথে ভেজা বন-পাহাড়ের গন্ধটাকেই ফিরসৌর আতরের গন্ধ ভেবেনিয়েছিলাম-জান্নাতুল ফিরদৌস। সেই গন্ধ মেখেই রোদ উঠল। বিস্তৃত সমতল সামনে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে সব মলিনতা। বিকেলের মেঘ ছেঁড়া রোদে ঝিলমিলিয়ে উঠছে মাঠে ফুটে থাকা হলদে গোল্ডেন কাপের পাপড়ি গুলো। হাঁসের মতন কি যেন এক পাখি উড়ে বেড়িচ্ছিল মাঠ জুড়ে। জেঠু বলেছিল,- ওর নাম ভরদ্বাজ। ও আসলে পাখি নয়, পাখির শরীরে ঘুরে বেড়ানো ঋষি। ইতিমধ্যে চোখে পড়েছে মদমহেশ্বর মন্দিরের মাথায় উড়া সাদা নিশান। তবে তো পৌঁছে গেলাম !

কোথায় এলাম? কেন এলাম ? পঞ্চ কেদারের দ্বিতীয় কেদার এই মদমহেশ্বরে এসে অনুভব করেছি, প্রকৃতিই যেন ঈশ্বর। আমার পূণ্যের লোভ নেই। হিমালয়কে কাছ থেকে দেখেছি, এইটাই তো পাওনা। মন্দিরের পাশেই শকুন্তলার হোটেল। সেখানেই উঠেছিলাম আমরা। হাঁড় কাপানো ঠান্ডা পড়েছিল। আমার গায়ে অল্প জ্বর। মন্দির থেকে আরতির ঘন্টা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। টিনের চালে বৃষ্টি টুপটাপ ঝরে পড়ছিল, ঠিক যেন নস্টালজিয়ার মতন। কম্বল মুড়ি দিয়ে অনুভবের চেষ্টা করছিলাম , আপাদমস্তক নাস্তিক আমার জেঠু কেন হিমালয়ের এইসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান। এই যে মানুষগুলো, মৈঠানিজি, পরভীন, শকুন্তলা, নানুর সেই বৃদ্ধা, শিশুপিল - তাদের মনটাও হিমালয়ের মতন বড়। আর মনের আরাম তো আছেই। কালিদাস তো কবেই বলেছেন -

"ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহু : কম্পিত দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্ঠ-মৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্ন - শিখন্ড- বর্হ।।"

(কি স্নিগ্ধ সমীরণ হিমালয়ের! গঙ্গা প্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণাবাহিত এই বাতাসে, দেবদারু বৃক্ষগুলি বারবার কম্পিত হয়, ময়ূরেরা পেখম মেলে প্রতি মুহূর্তে অপরূপ শোভা ধারন করে, শিকার সন্ধানে পরিশ্রান্ত কিরাতদের দেহ মন জুড়িয়ে যায়।)

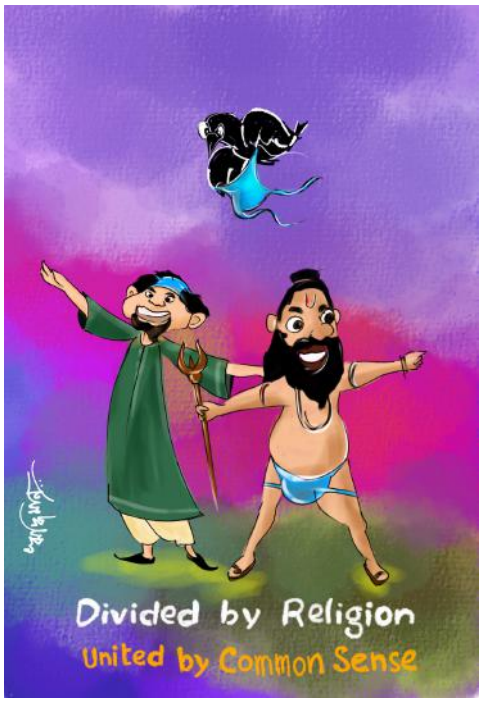

এক রাজার দেশে মহামায়ার আবির্ভাব

--সমিতা চক্রবর্তী, ওমান

রাতের তারা খচিত আকাশ দেখতে দেখতে কখন তন্দ্রা এসে গেছিল ঠিক মনে নেই। তবে চোখের কাছে হঠাৎ আলো পড়ায়ে একটু বিরক্ত হয়ে চোখ মেলল শুভমিতা। বিমানসেবিকা ধীরে ধীরে সকলকে জাগিয়ে তুলছেন। পাশের সীটে ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েকে ডেকে দিতে গিয়ে প্লেনের ছোটো জানালায়ে চোখ পড়ল নিশুতি আঁধারের আকাশ চিড়ে সোনার নেকলেস এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত, দিগন্ত বিস্তৃত। এত অবাক হয়ে দেখেছিল শুভ, যে ভুলে গেল মেয়েকে ঘুম থেকে ডাকতে।যাই হোক মাস্কাট সীব এয়ারপোর্টে এসে নামা গেল। প্রথমবার বিদেশে ইমিগ্রেসন সেরে সুটকেস ও মালপত্র নিয়ে মেয়ের হাত ধরে বাইরে এলো শুভ। পাঁচমাস পর নবারুণের সাথে দেখা হবে। মে মাসে মানে বৈশাখের শেষে এসেছিল নবারুণ এখন অক্টোবর আশ্বিনের মাঝামাঝি মেয়েকে নিয়ে শুভ এলো।মাস্কাটের দমকা গরম হাওয়া যেন মুখ ও শরীরকে কাঁপিয়ে দিল।

নবারুণকে দেখে থমকে গেল শুভ। ঠিক দেখছি তো? সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। উথল-পাথাল হয়ে গেল। মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে নবারুনের আদর আর শেষ হয়ে না। এত বড় পারকিং লোট ক্রস করে গাড়িতে মালপত্র তুলে রওনা হল। রাউন্ডআবাউট ঘুরে গাড়ি ১০০কিমিতে চলতে শুরু করল।কি পরিষ্কার শহর।দুধারে সবুজের গালিচা। স্ট্রীটলাইট চকচক করছে।
আধ ঘণ্টার মধ্যে ৪০ কিমি পার হয়ে গন্তব্যস্থলে এসে পরলাম।

ওল্ড মাস্কেটের শিব মন্দির

কলকাতা থেকে দুর্গাপূজার চতুর্থীর দিন রওনা হয়েছিলাম। চারিপাশ গমগম করছে। তবে সে চতুর্থী কুড়ি বছর আগের কলকাতার কথা। তখন এরকম পুজো নিয়ে পাগলামি ছিলনা। আলো ঝলমল কলকাতা থেকে পারস্য মরুভূমির দেশে এসে শুভ অবাক। পরিষ্কার রাস্তা, প্রশস্ত ও চওড়া কিন্তু কি নিস্তব্ধ।
নতুন বাড়ী, নতুন ফ্ল্যাট। সারারাত ধরে চলল গল্প – সে কি আর শেষ হয়ে? শুভ ও নবারুণ বুঝতে পারল না কখন ভোরের আলো ফুটল। আযানের ডাক শুনল। শুভ বারান্দায়ে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল হাল্কা খয়েরী পাহাড়ের সামনে উঁচু মিনার থেকে আযান ভেসে আসছে। হেসে নব কে কাছে টেনে নিয়ে বলল তা বেশ! অভ্যাস হয়ে যাবে।

আজ বিশ বছর আযানের ডাকেই ঘুম ভেঙ্গেছে শুভর। সন্ধ্যের সাঁঝে কখন অজান্তে আপন হয়েছে আযানের ডাক, শুভ মনে পরে না। যাই হোক !ষষ্টির দিন মন্দির যেতে হবে।পুরনো মাস্কাটে শিবমন্দির আছে সেখানে দুর্গা পূজা হয়ে। খুব যত্নে সুটকেস থেকে ষষ্টির নতুন জামা,শাড়ী ও পাঞ্জাবি বার করে শুভ তৈরী হয়ে নিতে গেল। তিন জন মিলে মাস্কাটে গিয়ে পুজো দেখতে গেল। সন্ধ্যার আলোয়ে প্রথম করনিশ দেখতে দেখতে শিব মন্দির গিয়ে উপস্থিত হলাম। বড় কাঠের কারুকার্য করা ফটক পেরিয়ে মন্দিরে গিয়ে মন ভাল হয়ে গেল।মূর্তি স্থাপনহয়ে গেছে, সুন্দরী মহিলারা দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছেন । আমাদের দেখে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন 'কি মাস্কাটে নতুন?' মাথা নেড়ে বলতে একটি টেবিল দেখিয়ে দিলেন,পুজোর চাঁদা দেবার জন্য। উৎসাহ করে আমরা চাঁদা দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ষষ্টির বোধনের পূজা দেখলাম।শুধু বিদেশ বলা ভুল হবে – মধ্যপ্রাচ্যে মসজিদের পাশে শাঁক ও ঘণ্টা বাজিয়ে উলু দিয়ে দুর্গা পূজা করা খুব সহজ নয়, বেশ সাহসের ব্যাপার।

১৯৯৯ সালে মাস্কাটের দুর্গা পূজাতে প্রথম আসা।

কি নিখুঁত হাতে প্রসাদের থালা সাজানো, পূজার ফুলের সাজি, মিষ্টির থালা, শুকনো ফলের রেকাবি এবং কত কি। কি ভাল লাগল পরিষ্কার উচ্চারিত মন্ত্র শুনে ও পূজার পরিবেশ দেখে।পূজার এলাহি সরঞ্জাম।
পাশ থেকে এক অপরিচিতা মহিলা ডাকলেন, নতুন এসেছ? আমি বললাম এই দুদিন হল।এসো, আমার সাথে । তুমি তো নতুন, এসো এসো প্রসাদ বিতরণ করবে এসো। আমার ছোটো মেয়ে পিছনে আস্তে আস্তে চলে এলো। মহিলা বলে চললেন – "আমাদের পূজার আয়োজন এই ঘরে হয়'। খুব খুশী হয়ে উচ্চ গলায়ে বললেন ' এই দেখ আমি নতুন বাঙ্গালি মেয়ে কে নিয়ে এলাম... আয়ে রে... প্রসাদ বিতরণ করবে এসো'। আমার মেয়ে খুব মিশুকে নয় কিন্তু সকলের সাথে কথা বলতে শুরু করে দিল। বাতাসে যে ধুপ ধুনা ফল প্রসাদের গন্ধ তাতে মন ভরে গেল।

শুনলাম মন্দির রাত নটা তে বন্ধ হয়ে যাবে, আর তারপর সকলে আই-স-সি র (Indian social ক্লাব) হলে যেতে হবে পুজোর আগমনী অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের ব্যবস্থা আছে।

বেশ! মজা লাগল এরম প্রস্তাব পেয়ে। সোশাল ক্লাবে গিয়ে বুঝতে পারলাম ভারতবর্ষের কত ভাষাভাষীর মানুষজন এ দেশে থাকেন । এক এক দিন এক এক রকমের অনুষ্ঠান হল। ছোটোদের নাটক, কুইজ, নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে এগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখে ভাল লাগল। পরপর ক দিন মন্দিরে পূজা তে যাওয়া, আড্ডা , সাজগোজ দেবীর আরাধনা, নতুন পরিচিত মানুষের সাথে যোগাযোগ ভারী ভাল লাগল।

অবাক হয়েছিলাম প্রতিটি মহিলার অপূর্ব রূপ ও সুন্দর শাড়ী বাহার দেখে। একজন আরেক জনের থেকে সুন্দর। মনে হল, স্বর্গের অপ্সরা ধরাতে নেমে এসেছেন। সোনার গহনাতে ঝলমল করছেন সকলে। কথায় কথায় জানতে পারলাম, দেশের রাজা সুলতান কাবুস বিন সাইদের রাজত্বে ধর্মের বিরোধ নেই। মধ্য প্রাচ্যে ওমান এক মাত্র দেশ যেখানে মসজিদের সাথে সাথে হিন্দুদের শিবমন্দির ও কৃষ্ণ মন্দির, শিখদের গুরদুওারা, ক্রিস্টিয়ানদের চার্চ একই শহরে বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া যায়। মন্দিরে যাওয়া আসার রাস্তা যে কি সুন্দর বলার অপেক্ষা রাখে না।কি নিখুঁত রাস্তা, সমুদ্রের গা ঘেঁষে সর্পিল পথে এগিয়ে চলেছে। একধারে আরব সাগর অন্যদিকে নেড়া পাথরের পাহাড়- হাজারী পর্বতমালা, যে বহুযুগ আগে সমুদ্র গহ্বর থেকে উঠে এসেছে। কোথাও সবুজের ছোঁয়া নেই।
কিন্তু রাস্তার মাঝে রঙ্গিন ফুলের বাহারি সাজ, মন কেড়ে নেয়। খেজুরের গাছে ভরা রাস্তার দুইধার।
দেখে ছেলেবেলার গান 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' মনে পড়ে গেল।'খর্জূর বীথী' মানে খেজুর গাছ বলেছিলেন আমার গানের দিদিমনি, তখন আমার আট বছর বয়েস হবে।নিজের মনে গড়ে তুলেছিলাম মরুভূমির দৃশ্য। সেই পাথুরে মরুভূমিতে যে সত্যি থাকতে আসব তা আমি জানতাম না।

মধ্য প্রাচ্যের মাস্কাট শহর যে এত উৎসবমুখর সে কি করে জানব। নবমীর রাতে সকলে মিলে চেপে ধরল চল নবরাত্রির ডান্ডিয়া নাচে যোগ দিতে। সদ্য কলকাতার উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগমন আমার, তাই একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। ১৯৯৯ সালে কলকাতাতে বাঙ্গালীদের মধ্যে ডান্ডিয়া নাচ বা নবরাত্রীর প্রচলন ছিল না। তাই শুধুমাত্র ঔৎসুক্য নিবারণ না করতে পেরে চললাম বন্ধুদের হাত ধরে। নতুন অভিজ্ঞতা। তারা নিয়ে এলো কৃষ্ণ মন্দিরে। কি সুন্দর মন্দির, পরিছন্ন ভালবাসার মন্দির।শ্রীকৃষ্ণ, গনেশজী আর জয় মাতাদির মন্দির। কেন জানি না, আমার মনে হল এ যেন তীর্থস্থান। ছোটো টিসু কাগজে মোড়া ঘিয়ে তৈরী মিষ্টি প্রসাদ পেলাম। মুখে দিতে একেবালে গলে গেল। এত সুন্দর সেই প্রসাদে র স্বাদ। আজ বিশ বছর পরেও স্বাদের কথা ভুলে যাই নি। এখন মনে হয় সত্যি কি একদিন এই মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যেতে হবে? ভাবলে কষ্ট হয়।

কৃষ্ণ মন্দিরে বিরাট হলঘরে গুজরাটি গানের সাথে চলছে ডান্ডিয়া নাচ। আমার বন্ধুরা নাচ করতে অনুরোধ জানাল। যদিও কলকাতা তে এ নাচ করিনি, এদিক ওদিক তাকিয়ে নাচে যোগ দিয়ে দিলাম। আমার মেয়ে অবাক হয়ে আমায় দেখছে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল এ কি করছে মা? অনাবিল আনন্দর জোয়ারে ভেসে গেলাম। ছেলে মেয়েরা মিলে গোল গোল করে ঘুরে ঘুরে হাতে তালি দিয়ে গরবা নাচ করে চলল। কি সুন্দর নাচ নাচল। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম। আরেক দল জানাল এখানে বিরাট ডান্ডিয়া নাচের উৎসব প্রায়ে সারারাত ধরে চলে। সময়ের সাথে সাথে ডান্দিয়া নাচে পারদর্শী হয়ে গেলাম।

এ যেন এক আরব্য রজনীর এক দেশ। এ দেশের রাজার গল্প বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়ে। রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা এক রাজ্য, যেথায় সকল ধর্মকে সন্মান জানানো হয়। বিভেদ চোখে পড়ে না। মার্জিত ওমানীরা নিরহংকারী, পরোপকারী এ সদা হাস্যমুখে রয়েছে।
যাই হোক, দুর্গা পূজার গল্পে আবার ফিরে যাই।
প্রতি পাঁচ বছর পর পর মূর্তি বদল হয়ে। অবাক হয়েছিলাম জেনে মূর্তি কাঠের বাক্সে বন্দী হয়ে কুমারটুলি থেকে মাসকাটে আসে। গ্রীষ্মের ছুটিতে গিয়ে মূর্তি বায়না করে আসেন বঙ্গীয় পরিষদের এক সদস্য।তারপর ভারতীয় দূতাবাস থেকে অনুমতি নিয়ে মা দুর্গা কলকাতা বিমান বন্দর থেকে উড়োজাহাজে চড়ে আরব সাগর পারে মাস্কাট শহরে এসে উপস্থিত হন।কাস্টমের নিয়ম নিধি পেরিয়ে মা চলে আসেন সিদাব এলাকার শিব মন্দিরে। এই চলাচল প্রায় আশির দশক থেকে চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে ওমান প্রথম দেশ যেখানে মন্দির স্থাপনের সাথে সাথে হিন্দু দেবদেবীর পূজা শুরু হয়। এক প্রজন্ম পুজা শুরু করেন, কিন্তু প্রত্যেক দশকে নতুন মুখ এসে এই ঐতিয্যকে বহন করে নিয়ে যায় ।মানুষের আসা যাওয়ার পথে পরে এই শহর।এই কুড়ি বছরে কত মানুষ বন্ধু হলেন, কতজন ভুলে গেলেন এবং কত অজানা মানুষ কাছে টেনে নিলেন।এও মনে হয় শিবমন্দির ও কৃষ্ণমন্দিরের আশীর্বাদ।
পুজার একমাস আগে মহিলাদের মিটিং হয়। সেখানে ঠিক হয়ে কোন গ্রুপ মূর্তি সাজাবেন, কোন দল
সকালের ও সান্ধ্য ভোজ দেবেন, মন্দিরের চালচিত্র কারা হাতের কাজে সাজিয়ে দেবেন।কি অপূর্ব হাতের আঁকা ও কারুকার্যে ভরে ওঠে মন্দিরের একচালা ঠাকুর। এখানে তিলোত্তমা ওরফে সিনু, আলপনা, কেকা, রোশনীর অবদান অসীম।এদের তত্বাবোধনে বেশ কিছু উৎসাহী মহিলারা এগিয়ে আসেন সাহায্যের হাত এগিয়ে দেন।পূজার প্যান্ডেল, চাঁদা, দর্শনার্থীদের ভোগ ও জলখাবারের দায়িত্বে পুরুষের টীম খুব দৌড়াদৌড়ি করেন। স্বপন, আমিতাভ, গৌতম, ইন্দ্রনীল, রবীন জহরের নাম উল্লেখ করতেই হবে। এদের না হলে পূজা অচল।পূজার মনহারী বাজারের দায়িত্বে বিজয়কৃষ্ণ ও খটাশ ওরফে অনির্বাণকে দেখা যেত ব্যস্ত থাকতে।অনিরুদ্ধকেও দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি।

হাতের কাজে সাজানো দুর্গা মণ্ডপ- এক মাস ধরে এই কাজ চলে। পুজোর দু সপ্তাহ আগে শুরু হয়ে বাচ্চাদের বিভিন্ন বয়েসের বসে আঁকা প্রতিযোগিতা ও কুইজ দিয়ে। রান্না প্রতিযোগিতাতে নিপুণতা বেশ পরিলক্ষিত হয়। আমি বেশ কয়েকবার এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকা নিয়েছি, আবার কয়েকবার আয়োজনের ভার পড়েছিল আমার উপর। একসাথে অনাবিল আনন্দ ভাগ করে নেবার সবচেয়ে ভাল সময় এই শারোদৎসব।২০১০এর দশকে সুদেষ্না রায়, প্রিয়াঙ্কা, পায়েল, মিতা, লোপা, লিসার অবদান মনে রাখার মত। পরতেকের নাম উল্লেখ করা মুশকিল তবে সকলে প্রাণ দিয়ে পূজার সাফল্যের প্রয়ই দৃষ্টি বান থাকেন। পুরোহিত ও তাঁর সহকারী দুজনেই ছুটি নিয়ে নেন প্রায়ে পাঁচদিন এবং কি আন্তরিকতার সাথে পুজো করে থাকেন। প্রতিটি মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হয় আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দিয়ে। এখানে টুটুন ওরফে সুশান্ত ও অভিজিতদার কথা উল্লেখ না করলে মাস্কাট পূজার গল্প অসমাপ্ত থাকবে।মুস্কাটে এঁরা দুর্গাপূজা করেন এবং এত সুন্দর করে পূজা করেন যে মনে হয়ে আমরা বাড়ীর পুজো উপভোগ করছি।

ষষ্ঠীর মূল আকর্ষণ 'মসীলিপি'- বাংলা ম্যাগাজিন যা প্রায়ে ১৩ বছর সগৌরাবে এগিয়ে চলেছে। ম্যাগাজিনের কাজ পূজার দু মাস আগের থেকে শুরু হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি ম্যাগাজিন টি বেশ উঁচু মানের। বিদেশের মাটিতে বাংলা ভাষায়ে পত্রিকা বার করা এক অনবদ্য উপস্থাপনা। ম্যাগাজিন বিক্রির মূল্য দিয়ে আমরা বাঙ্গালীরা একটি এন.জি.ও কে দান করে দেওয়া হয়ে।

মহিলারা ভোর বেলা স্নান সেরে নতুন বস্ত্রে এসে মায়ের পূজার জোগাড়, ফল প্রসাদ, ভোগ আয়োজন করেন। এখানে সব সিনিয়ার দিদি ও বউদিরা জুনিয়ারদের সুন্দর করে পূজার কাজে গাইড করে দেন। বলতে বাধা নেই, আমি মস্কাটে এসে পূজার কাজ শিখেছি, গার্গী বউদি, আলোদি, বন্দনাদি, রুনুদি, কৃষ্ণাদি , সুজাতাদি, রুচিরা ও মিঠুর কাছে। পূজার জোগাড় ও গল্প- এর জন্য আমরা সকলে সারা বছর অপেক্ষায়ে থাকি। পূজার নিয়ম নিষ্ঠা মেনে পূজার তিন দিন দুবেলা অঞ্জলি দেওয়া হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে তো আর অফিস বা স্কুলের ছুটি হয়ে না, তাই সন্ধ্যে বেলায় অঞ্জলীর ভীড় খুব বেশী। নবমীতে ধুনুচি নাচ সকলের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রত্যেক দিন ভোগ ও জলখাবার শুধু পেটপুজো নয়, বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের হাত, ভালবাসার চাদরে ভরিয়ে রাখে সারা বছর।দশমীতে নিয়ম মেনে সকালের পুজো শেষ হলে, ভাষানের সময় এসে যায়ে। মহিলা রা লাল পাড় সাদা শাড়ীতে মাকে বরণ করেন। বরণ শেষে ছোটো করে একটু সিন্দূর খেলা হয়ে যায়ে।মন রাঙ্গিয়ে ওঠে, শরতের শেষবেলায় হৃদয় বলে 'মা তুমি কবে আসবে আবার?

১৯৯৯ সালে মন কেঁদেছিল কলকাতা পূজার জন্য, তবে আজ কাঁদছে মাস্কাটের পূজার জন্য। সুন্দর পূজা দেখতে দুবাই, আবুধাবি থেকেও অনেক বাঙ্গালীরা প্রতিবছর আসেন।

বিয়জার দিন ঠাকুর বিসর্জন হয়ে না। ওমানে বিসর্জনের নিয়ম নেই। পাঁচ বছর এক ঠাকুর চলে, তাঁর পর কোন বাঙ্গালী পরিবার মূর্তি বাড়িতে নিয়ে রাখেন, অথবা জল দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হয়ে। তবে বাকি সময় পাঁচ বছর ঠাকুর প্যাকিং বক্সে ওয়ারহাউসে থাকেন সসন্মানে।

বিজয়া উপলক্ষে একসময় বাঙ্গালীরা ভীড় করতেন পূজার পরের শুক্রবার অস্কো ক্যাম্পে। কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া হত।পরে বাঙ্গালী জনসখ্যা বেড়ে গেলে তা চলে এলো বিরাট বিজয়া সম্মেলনীতে। ভিন্নস্বাদের নাটক, গান, নাচ, কবিতা, ফ্যাশন শো চিত্তাকর্ষক বহু উচ্চমানের অনুষ্ঠান।সকলের সাথে একছাতের তলায় দেখা ও আনন্দ সমাপন হয় ভুরীভোজ দিয়ে। একটা মজার গল্প না বললে পুজোর কথা শেষ হবে না। সাধারণত শুক্রবার সন্ধ্যায়ে এই অনুষ্ঠান হয়ে এবং কিছু বাঙ্গালী মহিলা মা সন্তোষীমার ভক্ত, তাই তারা এক টেবিলে বসে নিজেদের অপূর্ব নিরামিষ রান্না করে আনেন এবং একসাথে খান। বাড়ী থেকে আনা রান্নার পরিমাণ ভাল থাকত কারণ আমরা সকলেই একবার করে চেখে নিতাম রান্না কেমন হয়েছে। রোজ দেখা না হলেও এ মধুর স্মৃতি আমরা বহন করে যাব। সকলে যে কলকাতা ফিরব তা নয়ে, তবে বিশ্বের যে শানে থাকি না কেন,মাস্কাটের পূজো মনে থাকবে আমাদের সকলের মনে।
আরব দেশে এসে জেনেছি বাংলাদেশীরাও সোহার বলে আর একটি শহরে দুর্গা পূজা করেন। আমরা একবার গেছিলাম বছর ১৮ আগে। কি আন্তরিকতা ও আদর আপ্যায়ন করেছিলেন, আজ মনে আছে। পূজার ভোগ্যার স্বাদ আজও ভুলিনি।

২০১৯ আমাদের বিশবছর মাস্কাটে পূর্ণ হল, এবং সস্ত্রীক বঙ্গীয় পরিষদের সাথে জড়িত থাকায় বিজয়া সম্মেলনীতে আমরা পরিষদের তরফ থেকে সন্মানীত হলাম। দেশের বাইরে সন্মানে ভূষিত হয়ে খুব ভাল লেগেছিল।

আরব্য রজনীর রুপকথার মত এও এক রাজার দেশের গল্প যেখানে সকাল সন্ধে আজানের ডাকের সাথে মিশে যায় হিন্দুদের শঙ্খধ্বনি। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠা পরার সাথে মিশে যায় মানুষের জীবন কথা।করনার অতিমারীতে আমাদের দু বছর পূজো বন্ধ হল এ শহরে। নবরাত্রির আড়ম্বর নেই। অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় বহু পরিবার দেশে ফিরতে বাধ্য হল। তবুও জীবনের কর্ম সময় যেহেতু মাস্কাট, তাই কৈলাসবাসিনীর মধ্যপ্রাচ্যের আসা যাওয়ার পথ খুলে যাক। নতুন রাজার আমলে ধর্মের সমান্নতা বজায় থাকুক, দেশী বিদেশী মানুষ স্বনির্ভর ও ভ্রাতিত্ববোধ বজায় থাকুক এই প্রার্থনা জানাই মা জননীকে।শুভমিতা ও নবারুণের সংসার ধীরে ধীরে ভরে উঠল ছেলে মেয়ে নিয়ে। সময়ের সাথে তারাও নিজেদের তৈরী করতে বিদেশে চলে গেল। এখন নবারুণ ও শুভ কতই বা আর গল্প করবে? আশায় বসে থাকে কখন সইব এয়ারপোর্ট থেকে আবার কবে ছেলে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসবে? জীবন এগিয়ে চলে, আমরা সবাই জানি, সে থেমে থাকে না।

হল্যান্ডের দুর্গাপূজা

--শুভ্রদীপা ভট্টাচার্য্য, হল্যান্ড

সময় ও যুগের আবর্তনে বাঙালির দুর্গাপূজা ধর্ম ও উপাচারের বহু উর্ধ্বে উঠে এক মিলনোৎসবের রূপ নিয়েছে। নেদারল্যান্ডস এও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আমার এখানে পদার্পণ ২০০৬ এ। তখন এখানে বাঙালির সংখ্যা বেশ কম, কিন্তু যাদের সাথে আলাপ হয়েছিল, তারা বড়ই আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই পরবর্তী কিছু বছরের মধ্যে তাদের সাথে গড়ে ওঠে এক নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক এবং তাদের হাত ধরেই ২০১০ সালে জন্ম হয় 'কল্লোল'এর। বাঙালি একত্রিত হলে দুর্গাপূজা হবেনা, এ কিকরে হয়?! ২০০৯ এর এক বরফাবৃত সন্ধ্যায়, এ্যাইন্ধোবেন শহরের এক অ্যাপার্টমেন্টে বসে, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম, 'পূজো হবে'!!যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়; প্রতিমার খোঁজ কুমোরটুলিতে, পূজার সামগ্রীর লিস্ট বানানো, হল বুকিং এর খোঁজ করা ও সর্বোপরী পুরোহিত এর ব্যবস্থা।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, নেদারল্যান্ডসে ২০১০ এ প্রথম পূজা যখন শুরু হয়, তখন এখানে প্রয়োজনীর সামগ্রী বিশেষ কিছুই পাওয়া যেতো না, তাই যথাসম্ভব ভারত থেকেই আনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পুরোহিত এসেছিলেন জার্মানি থেকে। কল্লোলের উদ্দেশ্য ছিল একটি ঘরোয়া পূজার পরিবেশ সৃষ্টি করার, যেখানে মানুষ সব ভুলে নিখাদ আনন্দের টানে মিলিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে তারা সফল; বহুবছরের সুখস্মৃতি বহন করে এগিয়ে চলেছে কল্লোলের পূজা। ২০১৭ থেকে নেদারল্যান্ডসে শুরু হয়েছে আরো ৩টি পূজা। আমস্টারডাম এর কাছে দুটি: হল্যান্ডে হইচই এবং আনন্দধারা; এবং এ্যাইন্ধোবেনে: বঙ্গহোবেন। প্রত্যেকটি পুজোতেই ফল কাটা, ভোগ রান্না থেকে শুরু করে দর্শনার্থীদের আপ্যায়ন, সদস্যরা নিজেরাই যত্ন সহকারে করে থাকেন।

শারদ সম্প্রীতি

--সুমেলা ব্যানার্জী, সুইজারল্যান্ড

বারো মাসে তেরো পার্বণ´- বাঙালির সৃজনধর্মী প্রতিভারই আনন্দমুখর অভিব্যক্তি । বাঙালি বিশ্বাস করে `প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী কিন্তু উৎসবের দিনে বৃহৎ´। ধর্মের আবরণ সরিয়ে দুর্গা মা কে মেয়ে রূপে বরণ করি আমরা। বোধন থেকে বিসর্জন আমাদের জীবনে তোলে এক অপরূপ হিল্লোল। ২০১৪ সালে বিদেশে বাঙালিয়ানার প্রতীক হিসাবে জার্মানির মিউনিখ এ জন্ম নেয় সম্প্রীতি। জন্মলগ্ন থেকেই সম্প্রীতির সদস্যরা নববর্ষ , দীপাবলি , বসন্ত উৎসবের রঙে নিজেদের রাঙিয়েছে। উৎসব পিপাসু সম্প্রীতির সদস্যদের উৎসবের মুকুটে নতুন পালক দুর্গোৎসব। দুর্গাপুজোয় ঘরে ফেরার তীব্র বাসনা থেকেই ২০১৯ সালে সম্প্রীতির পঞ্চম বর্ষে শুরু হয় শারদ সম্প্রীতি।

পুজোর সাথে জড়িয়ে থাকে বহু অনুচ্চারিত প্রশ্ন - অনুষ্ঠান ভবন নির্বাচন , ঠাকুরের বায়না , পুরোহিতের ব্যবস্থা , কলাগাছ , যজ্ঞের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি পুঁজি। কিন্তু সম্প্রীতির সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সামনে হার মানে সব `বাধার বিন্ধ্যাচল´।

কুমোরটুলির অমরনাথ ও কৌশিক ঘোষের কাছে বায়না দেওয়া হয় ঠাকুরের , সঙ্গে জয়ঢাক। মা জাহাজে চেপে পাড়ি দেন তাঁর প্রবাসী বাঙালি পরিবারের থেকে পুজো নিতে। পুজোর এক বছর আগে থেকেই চলেছে প্রস্তুতি পর্ব। এর মাঝে যারাই কলকাতায় গেছেন, সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে পুজোসামগ্রী।

বাঙালির উৎসবের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে তার সংস্কৃতি। আর সম্প্রীতির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ছিল পূর্ব পশ্চিমের মেলবন্ধন। একদিকে যেমন Spanish Flamenco, Hungarian নৃত্যশিল্পীরা মাতিয়ে দিয়েছিলো , তেমনই আবার রাশিয়ান নৃত্যশিল্পীরা তাল মিলিয়েছিল আমাদের semi classical নৃত্যে। ভীমবধ নাটক প্রদর্শন করেছিল সম্প্রীতির সদস্যরা। খাদ্যরসিক বাঙালি তার রসনার তৃপ্তি করেছিল Food stall র মাধ্যমে। আর তার সাথে ছিল বাঙালির চিরন্তন নির্ভেজাল আড্ডা। বিসর্জনের দিন ছিল সিঁদুর খেলা। সিঁদুরের রক্তিম আভার সাথে মিশে গিয়েছিলো বিষাদের সুর - `যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়´। মনকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে আসছে বছর আবার হবে। যদিও ২০২০ তে দুর্গাপুজো করা সম্ভব হয়নি। ২০২১ তে আবার কোমর বেঁধেছে সবাই।

সম্প্রীতি দুর্গাপুজোকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিল। প্রতিটি সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এনে দিয়েছিলো সফলতা; সাথে ছিলেন Consulate general of India-Munich এবং West Bengal Govt র সহায়তা। সুন্দর , সুস্থ চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিলো সম্প্রীতির প্রতিটি ব্যবস্থাপনার মাঝে। বিদেশে থেকেও বাঙালি যে তার সংস্কৃতিকে ভোলে না , তা প্রমান করে দিয়েছে সম্প্রীতি। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে এক ঝলক আলো ঝরে পড়েছে নতুন প্রজন্মের কাছে। প্রবাসী বাঙালি হৃদয়কে সংস্কৃতির বন্ধনে, সর্বোপরি ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে সম্প্রীতি।

'আনন্দধারা'

--সুজিত মণ্ডল, নেদারল্যান্ডস

দূর্গাপূজা-বাঙালীর এক অন্য আবেগ।এই আবেগকে সঙ্গী করে 'আনন্দধারা'-র উৎপত্তি। আড্ডা-আহারে প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী বন্ধু, হঠাৎ-ই একদিন স্মৃতির হলুদপাতা খুলে ছোটবেলার কিছু টুকরো ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করে, যে তারা তাদের শিকড় ছিঁড়ে বেড়িয়ে এলেও তাদের বাঙালী সত্ত্বা আজও তাদের অন্তরে প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত। সূচনা হয় নেদারল্যান্ডসে এক নতুন আনন্দর গোড়াপত্তন-'আনন্দধারা'। আর এই 'আনন্দধারা'-র হাত ধরে উদযাপিত হয় বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 'দূর্গাপূজা'।
যেহেতু এবার পঞ্চম বর্ষ কলকাতা থেকে ইতিমধ্যে নতুন প্রতিমা রওনা হয়ে গেছে। COVID-এর সমস্ত বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও তোড়জোর চলছে পুরোদ্যোমে।
আনন্দধারা'-র বিশেষ আকর্ষণ তার মন্ডপসজ্জা।নেদারল্যান্ডসে একমাত্র তারাই 'THEME' পূজার কর্ণধার - তা সে বনেদীবাড়ির সাবেকিয়ানা নিয়ে আসাই হোক বা ঐতিহ্যবাহী চাইনিজ প্যাগোডা। এবারের পূজা নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই চলছে তাই উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং বহুল কল্পনা।

'শুরু হয়েছে বিভিন্ন সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পর্যায়নুক্রমিক মহড়া। রয়েছে সাথে পেটপূজার বাহারি সব সুস্বাদু লোভনীয় খাবারের জল্পনা। সব মিলিয়ে এবারের 'আনন্দধারা'-র পূজায়োজন চলছে পূর্ণগতিতে। ক্ষুদেরাও সেখানে কেউ মন্ডপসজ্জার আঁকাতে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়ায় তাদের দক্ষতা অনুযায়ী অংশগ্রহন করছে। এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঙালীয়ানার ঐতিহ্যের পারম্পরিকভাবে প্রসারিত করার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাই 'আনন্দধারা'-র।

এষ সচন্দন
গন্ধ পুস্প বিল্ব পত্রাঞ্জলিঃ
যেখানেই থাকি মিলি এই সুরে
মনে প্রাণে আমরা বাঙালি

রিজু দাস (১৪ বছর), ভারত

জিত বোস (৯ বছর) সুইজারল্যান্ড

সমন্বয় রায় (৮ বছর), সুইজারল্যান্ড

আর্চিষা রায়(৭ বছর), সুইজারল্যান্ড

রুদম নন্দী (৬ বছর), হায়দ্রাবাদ

শারিণী মল্লিক (৯ বছর) , বেলজিয়াম

মানিনী অবস্থি (৮ বছর), আমেরিকা

আর্চিষা রায়(৭ বছর), সুইজারল্যান্ড

পিয়া ঘোষ(৬ বছর), নিউজিল্যান্ড

আজকের দূর্গা আমি দূর্গা

ঋতুপর্ণা পাল, অস্ট্রেলিয়া

রিয়া ব্রাহ্ম দে, ওমান

আরাত্রিকা দাস, ভলভার হ্যাম্পটন, ইউ কে

পিঙ্কি সরকার, নাইজেরিয়া

একটি চিরন্তন প্রেমের আলেখ্য

---মানিক পাল, বেলজিয়াম

তুমি জানতে, জীবন প্রদীপের শিখা ক্ষীণ হয়ে আসছে
তোমার চব্বিশ বছরের পাকানো সলতেটির অক্ষমতায় ,
তাই নিশিরাতে লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের অশনি সংকেত,
হয়তো জানিয়ে দিত তোমার জীবন ছুটির ঘন্টায় ।।

সমুদ্র পতনের শঙ্কায় চাঁদটি যেমনি
আঁকড়ে ধরে থাকে বিশাল কালো আকাশটিকে,
তেমনি তুমি আমায় জড়িয়ে ধরে রাখতে
যদিও জানতে, ছুটির ঘন্টা থামিয়ে দেবার আমার অক্ষমতাকে।।
সীমাহীন অবাধ্য প্রেমের অন্তহীন সাগরে
অনিশ্চয়তার ভেলায় দুরন্ত যুগলের যাত্রা ছিল অফুরন্ত অঙ্গীকারে ,
দুজনেই চেয়েছিলাম এক চিলতে করে জমি কিনতে
যেখানে মনের শিকড় নেমে গেছে অনেক অনেকটা গভীরে ।।

তুমি চেয়েছিলে রাধার মত প্রেমে কলঙ্কিনী হতে,
আমি চেয়েছিলাম কৃষ্ণের বাঁশি ছিনিয়ে তোমায় শোনাবো বলে,
তুমি চেয়েছিলে ভালোবাসা মোদের কোন নামে লিখে যেতে,
আমি চেয়েছিলাম নামহীন প্রেম পাথরে ক্ষুদিয়ে রাখতে ।।

চুম্বনের দৃঢ়তায় রাতটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতে অনন্তকালের রাতে,
শরীরের উষ্ণ উপত্যাকায় গলিয়ে দিতে চাইতে আমার দাম্ভিক পৌরুষত্বকে।
নিরালা যামিনীর আহ্লাদ অবসাদে নেতিয়ে পড়তে আমার সবল বাহুতে
ফিসফিসিয়ে বলতাম –অর্চি, তুমি চলে গেলে
কে বাঁচবে মোদের অবিকশিত প্রেমের কুঁড়িটিকে?

আধভেজা করুন ওষ্ঠে মুক্তো ঝরিয়ে বলতে –
দূর পাগলু, প্রেমের কি কোন মৃত্যু আছে ?
প্রেমের জন্ম আছে মৃত্যু নেই,
প্রেম কোটি বছর আগে ছিল, এখনোও আছে,
কোটি বছর পরেও থাকবে প্রেমিকদের মাঝে ।।

চোখের খাঁজের অবাধ্য অশ্রুবিন্দু
তোমার কপালে ঝরতে না দিয়ে বলতাম -
তুমি হারিয়ে গেলে কোথায় খুঁজবো তোমায়?
বলতে – মানু, আমি নক্ষত্র হয়ে লুকিয়ে থাকবো সপ্তর্ষি মণ্ডলের আড়ালে,
আমি তোমার প্রেমের চাতকিনী হয়ে উড়ে বেড়াবো নীল হ্রদের উপকূলে।
আমাকে খুঁজে পাবে তুমি তাঞ্জেনিয়ার সারেঙ্গেতি জঙ্গলে
যেখানে ভরা পূর্ণিমায় থাকবো আমি নগ্ন তনু ভেজাতে।
চুলের গন্ধ ছড়িয়ে দেব বেলী ফুলের পাপড়িতে
কুচযুগলের ঘ্রাণ পেয়ে যাবে তুমি হাসনাহেনার মোদিরাতে ।
পূর্ণিমার চাঁদ ধরে নিয়ে এসে দেখা দেব আমি কায়াতে,
নায়েগ্রার রামধনুতে মিশিয়ে দেব আমার অপূর্ণ প্রেমের মায়াতে।।

অর্চি , বহু কাল ধরে স্মৃতির নিরুত্তাপ ছাই
আশার কৌটোয় ভরে খুঁজে বেড়িয়েছি তোমায়,
কত রাজপথ কত জনপথে, নীল হ্রদের উপকূলে।
সপ্তর্ষি মণ্ডলের আড়ালে, সারেঙ্গেতির জঙ্গলে।
বেলী ফুলের পাপড়িতে, হাসনাহেনার মোদিরাতে।
কোথাও পাইনি খুঁজে নায়েগ্রার রামধনুর জলগর্ভরে ।।

হয়ত এই জন্মে খুঁজে পাবোনা তোমায় দেবতার করল গ্রাসে,
কথা দিলেম, জন্মান্তরের ধ্রুবতারা হয়ে থাকবো আমি
তোমারই বাহু ডোরে, অনন্তকাল সপ্তর্ষি মণ্ডলের আড়ালে।।

প্রেম

-শিবানী মুখার্জি পান্ডে, ভারত

মীরাবাঈ এর প্রেমিক কৃষ্ণ
জ্বলতে পারে রাজপ্রাসাদে
কলির মোহন ঘরে ঘরে
জ্বালিয়ে চলে ঈরামীরাদের

প্রেম না দয়া
প্রেমিকের যে হাতের খেলা
জ্বলার রসদ পেলে পরে
জ্বলে যেমন রাজপ্রাসাদে
তেমনি জলে কুড়ের ঘরে

প্রেমের খেলায় যেমন কৃষ্ণ
মোহন তেমনি তারই পাশে
পার্থক্য এই যে শুধু
কৃষ্ণ খেলে রাজপ্রাসাদে
মোহন খেলে মাটির ঘরে।।

নিষিদ্ধ চৌকাঠ

--কল্যাণী চক্রবর্তী ,ভারত

তারায় বোনা ভুবনডাঙার মাঠ
তাঁত, আঁচলে জরি, ডুরে
পার হয়ে যায় নিষিদ্ধ চৌকাঠ
পার হয়ে যায় কোপাই নদী, শনিবারের হাট

পার হয়ে যায় খোয়াই মোরাম ফুল ডাঙ্গার মাঠ
সামনে নিয়ে চাঁদের আলো বিপুল অবকাশ
সঙ্গীত হয় গণ্ডি ঘেরা আনমনা বাতাস
সুখের ঘরে দুয়ার দিয়ে ঘুমায় সুখী জন।

আমি শুধু একলা হাঁটি, অশান্ত নির্জন।
এই আঁধারেই যেতে হবে খুঁজতে আঁতিপাঁতি।
কোন আঁধারে লুকানো আছে জাতিস্মরের স্মৃতি।

মনের কথা

--হারাধন কথা, ভারত

আজও আমি বসে আছি
তোমার পথ ও চেয়ে
পাই যদি গো একটু পরশ,
সেই আশাটা নিয়ে
আশায় - আশায় দিন কাটিলো
এখন গোধূলী বেলা
ধেনু লয়ে রাখাল ফেরে
আমার মন উতলা
কে বুঝিবে মনের ব্যথা
সুজন কেহ নাই,
আসি বলে সেই যে গেল,
কোথায় তারে পাই,
যে - দিকে চাই তোমায় দেখি
নয়ন করে ভুল
ভালোবাসায় কাঁদায় শুধু
বুঝেছি এই মূল।

মেঘালয় থেকে

--কৃষ্ণা দাস মন্ডল, ভারত

দূরে নিচে দাউ কি নদী
সিঁড়ি নেই প্রায় সন্তর্পণে নেমেই
ঝকঝকে পরিষ্কার জলে নুড়ি পাথরের শৈশব
লাফাতে দেখি
আশ্চর্য নীল আকাশের ছায়া এ জলে
পৌরাণিক স্তবগান এঁকেছে
দেখলাম পাড়ের বহু প্রাচীন পাথরগুলি
রতিক্রীড়া ও অর্গাজমের বেসামাল চিত্র হয়ে স্থির
আমাদের এখন এসব দেখা ছাড়া কিছুই
করার নেই
যেহেতু
পাড় নয়
নুড়ি নয়
নীল নয়
আকাশও নয়
আমরা আমাদের স্বচ্ছতা হারিয়েছি।

পেয়িং গেস্ট

--রুমা বিশ্বাস, ভারত

ম্যাডাম শার্লট এই সময়টায় backyard এর এই বাগানটিতেই মনোনিবেশ করতে পছন্দ করেন। স্বামী মাইকেল গিবসন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান জিনিসপত্র এনে,ভাইন স্ট্রিটের এই বাড়িটি সাজিয়ে তুলেছিলেন মনের মতন করে। ম্যাডাম শার্লটের বড় পছন্দের এই বাগানটির দেখাশোনা করা আর স্বামীর আনা বিপুল জিনিসের সম্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ করতেই করতেই সময় কেটে যেত বেশ, কিন্তু বয়স হচ্ছে। তাই ইদানিং এই বিশাল বাড়িতে মাঝে মাঝেই যেন একাকীত্ব গ্রাস করতে আসে। কোথাও একটা অজানা আশঙ্কা উঁকি দিয়ে যায় মনের কোণে।
রবার্ট বহুদিনের পুরনো ড্রাইভার কিন্তু ম্যাডাম শার্লটের কাছে যে কোনো বিষয়ে তার মতামতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"ম্যাডাম আপনার বয়স হচ্ছে, আমার মতে আপনি কোন পেইং গেস্টের কথা একবার ভেবে দেখতে পারেন।" প্রস্তাবটি একবার রবার্ট রেখেও ছিল শার্লটের কাছে ।
স্বামীর মৃত্যুর থেকেও একমাত্র মেয়ে লরার মাত্র ২২ বছর বয়সে হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ম্যাডাম শার্লট। লরাকে ঘিরেই যেন গোটা বাড়িতে একটা আনন্দের সুর বাজতে থাকতো। লরার জন্মদিনে, ক্রিসমাস ইভ এ মিস্টার এন্ড মিসেস গিবসনের বাড়ীটা যেন সেজে উঠতো স্বপ্নের দেশের এক মায়াবী আলোয়।চোখ বন্ধ করলেই ম্যাডাম শার্লট এখনো সেই সব দিনের ওভেনে বেক করা কেকের তাজা গন্ধ ,স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন।হেজেল নাট অ্যাপ্রিকট ক্রিম কেক ছিল লরার প্রিয়।

লরা চলে যাওয়ার পরে ওপরের তলায় ওর ঘরে আর সেভাবে আসেননি শার্লট।মাঝেমধ্যে সার্ভিস বয় দের ডেকে রবার্টই ঘরটি পরিষ্কার করে রাখে। স্বামী মাইকেল গিবসনের মৃত্যুর পরেও আট বছর কেটে গেছে,স্বামীর মৃত্যুর পর শার্লট অনুভব করেন যেন এক অদ্ভুত শূন্যতা তাকে ঘিরে ধরেছে। তিনি আগে চার্চের কিছু কাজ কর্মের দায়িত্ব নিজে থেকেই নিয়েছিলেন। প্রায় ৭০ এর কাছাকাছি পৌঁছে এখন শরীর ও আর সেভাবে সায় দেয় না। তাই নিয়ম মেনে শুধু prayer জন্যই চার্চে যাওয়া হয়।

উইলো আর ম্যপল tree তে ঘেরা রাস্তা ধরে একাকী হাঁটতে হাঁটতে শার্লটের মনে আসে নানান স্মৃতি,চোখের ওপর দিয়ে বয়ে যায় প্রকৃতির নানা পরিবর্তন। কখনো উইলো গাছগুলো ঢেকে যায় সাদা বরফে, চারিদিকে কেমন যেন ধূসরতা,আবার কখনও সেই ধূসরতা কাটিয়ে,চারিদিকে দেখা যায় নানা রঙের বাহার।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবর্তনটাও ধরা পড়ে শার্লটের নিজের কাছে। ম্যাডাম শার্লট বুঝতে পারেন যে বাড়ী, ঘরদোর আর স্মৃতির বিশাল বোঝা একাকী বইতে বইতে তিনি যেন ক্রমশ ক্লান্ত থেকে ক্লান্ততর হয়ে পড়ছেন। শুধুই বয়ে চলা, যেন একই নিয়মানুবর্তিতা ।

এতদিন তাই রবার্টের কথায় কর্ণপাত না করলেও আজ ভাবলেন তিনি প্রস্তাবটা মেনেই নেবেন। সেইমতো তিনি রবার্টকে ডেকে স্থানীয় খবরের কাগজে একটি পেইং গেস্টের বিজ্ঞাপন দিতে বললেন,আর তার সঙ্গে একথাটিও বললেন।

"যদি মনে হয় থাকার জন্য তারা উপযুক্ত তবেই ভাববো, মিস্টার রবার্ট আপনি যেন সবাইকেই বাড়ির ভেতরে আসার অনুমতি দিয়ে দেবেন না।"

এরপরে বিভিন্ন ধরনের মানুষের আনাগোনা শুরু হতে থাকে ভাইন স্ট্রীটের র সেই বিশাল বাড়িটাতে।

ম্যাডাম শার্লটের অবশ্য এখনো পর্যন্ত কাউকে সেভাবে পেইং গেস্টের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়নি।রবার্ট ও একসময় প্রায় হাল ছেড়ে দিতে শুরু করলেন আর মনে মনে ভাবলেন এই জন্মে ম্যাডাম শার্লটের পছন্দ মত কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয় একপ্রকার অসম্ভবই। তাই পরিবর্তনের আশা মনের মধ্যে থাকলেও। বৃদ্ধা শার্লট গিবসন আর রবার্টের দিনরাত্রি একইরকম ভাবে কেটে যেতে লাগল নিয়ম মেনে।

এরই মধ্যে একটি রবিবার মাদাম শার্লট চার্চ থেকে ফিরে নিজের ঘরে একটু রেস্ট নিচ্ছেন এমন সময় রবার্ট হন্তদন্ত হয়ে তার দরজায় knock করল।"

"ম্যাডাম,.....ম্যাডাম শার্লট, আমি অত্যন্ত দুঃখিত আপনাকে অসময় বিরক্ত করার জন্য। একজন পুরুষ ও মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার সাহায্যের আশায় এসেছেন আপনি যদি একটিবার তাদের সঙ্গে কথা বলেন।"

একটু বোধহয় চোখ লেগে গিয়েছিল মিসেস গিবসনের উনি দরজা খুলে রবার্টের উৎকণ্ঠিত চোখমুখ দেখে সহজেই অনুমান করলেন বিষয়টি একটু গম্ভীর, অগত্যা লাঠিটি নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন নিচে বসার ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকেই একটু চমকে উঠলেন মনে হলো 22 বছরের লরা যেন দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে,বাইরের দিকে চোখ করে, ছেলেটির বয়স আনুমানিক ৩০/৩২ । নিজেকে একটু সামলে নিজের পরিচয় দিলেন।

" আমি মিসেস গিবসন।"মেয়েটির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই কেমন যেন স্থির চুপচাপ ছেলেটির মুখ চোখে একটা অদ্ভুত উৎকণ্ঠা। সে কিছুটা যেন অনুনয়ের সুরে বলল আমি ইথেন জোনস আর ওর নাম, ছেলেটি বলার আগেই মেয়েটির ঘুরে এক অভিব্যক্তিহীন গলায় জানালো আমি ইভা, ইভা সাইমন।
মিসেস শার্লট দু'জনকেই বসার অনুরোধ করে বিশদে জানতে চাইলেন তাদের প্রয়োজনের কথা। ইথেনের কথায় যা জানা গেল ইথেন এবং ইভা একে অপরকে ভালোবাসে কিন্তু ইভার পরিবার সম্পর্কটা কোন মতেই মেনে নিতে রাজি নয়। এখান থেকে প্রায় আটঘন্টার দূরত্বে ওয়েষ্টার্ন এভিনিউতে তাদের বাড়ি দু সপ্তাহ আগে ইভা জানতে পারে যে সে সন্তান সম্ভবাএবং কথাটি ইথেন কে জানায়, ইথেন কে একটি চাকরিসূত্রে মাস দুয়েকের জন্যে যেতে হবে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় কিন্তু ইথেন এর অনুপস্থিতিতে ইভা কিছুতেই তার বাড়িতে থাকতে রাজি নয় কারণ গোটা বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষনশীল ইভার পরিবার কি ধরনের আচরণ ইভার সাথে করবে সে ব্যাপারে ইভাও যথেষ্ট নিশ্চিত নয়। তাই সে ইথেন এর সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ করে কিন্তু ইভার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা ভেবে ইথেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে সে কি করবে,এই অবস্থায় শার্লট গিবসনের পেইং গেস্টের বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ে। তাই আর কোন কথা না ভেবে তারা ওখান থেকে একপ্রকার কাউকে কিছু না বলেই ছুটে এসেছে যদি মিসেস শার্লট গিবসন তাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন। দুমাস বাদে ইথেন ফিরে এসে ইভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করবেন এবং অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থাও করবেন কিন্তু এই দুই মাস যদি ইভার পরিবার থেকে ইভাকে একটু আড়াল করে রাখা যায়।
যদিও পুরো কথোপকথন টাই মিসেস শার্লট ও ইথেন এর মধ্যেই হচ্ছিল, ইভা কোন কথাই বলেনি কিন্তু মিসেস শার্লট পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন মেয়েটি একভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। ইথেনের সঙ্গে কথার মাঝে যখনই চোখ গেছে মেয়েটির দিকে কেমন যেন এক অদ্ভুত মায়ায় ভরে গেছে মন,মনে হয়েছে যেন লরা ফিরে এসেছে আর একটু আশ্রয় চাইছে তার মায়ের কাছে।

নানান কথা মাথায় ভীড় করছিল মিসেস শার্লটের বুঝতে পারছিলেন না কি করা উচিত এই বৃদ্ধ বয়সে নানা ঝামেলা কি একা সামলাতে পারবেন যদি মেয়েটির বাবা খোঁজ পায় এবং এবং জোর করে ইভাকে নিয়ে যায় ,কি জবাব দিবেন ইথেন এর কাছে?
গোটা ঘরে যেন এক অদ্ভূত নিস্তব্ধতা সেই জমাটবাঁধা নিস্তব্ধতাকে ভেঙে শোনা যায় একটা কান্না ভেজানো গলার আওয়াজ।
" ম্যাডাম শার্লট প্লিজ আমাকে আর আমার সন্তানকে বাঁচান ওরা আমার সন্তানকে বাঁচতে দেবে না আর আমি ইথেন কে ছাড়া বাঁচবো না।" ইভা তার দুটি হাত ম্যাডাম শার্লটের হাতের মধ্যে চেপে ধরে যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। ম্যাডাম শার্লট, ইথেনের দিকে তাকিয়ে বললেন।
"এই দুমাস আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব তবে মিস্টার ইথেন আপনি যদি আপনার কথার খেলাপ করেন সে ক্ষেত্রে কোন বিপদের জন্য আমায় অবশ্যই দায়ী করবেন না আশা করি।"

ইথেন নিজের ও ইভার পরিচয় পত্র কিছু টাকা আর ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া যোগাযোগের ঠিকানা ম্যাডাম শার্লটের কাছে দিয়ে তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সন্ধ্যের দিকে চলে গেল ,শুধু যাওয়ার সময় ইভাএবং ম্যাডাম এর উদ্দেশ্যে এটুকুই বলে গেল তারা যেন ইথেনের প্রতি ভরসা রাখে সে কখনোই তার কথার খেলাপ করেনি।

পরের দিন ভোর হতে ম্যাডাম শার্লট এলেন ইভার ঘরে। বুঝতে পারলেন সে সারারাত ঘুমায়নি। সেটা তো স্বাভাবিক নানান উৎকণ্ঠা নতুন পরিবেশ তিনি ইভাকে বললেন "সে যেন কোন কিছুর জন্য সংকোচ না করে এবং চেষ্টা করে যেন নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে কারণ এটি তার নিজের এবং তার সন্তানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।"
ম্যাডাম শার্লটের হঠাৎ করেই মনে হল এখন যেন আগামী দু'মাস তার প্রচুর কাজ সে লরা কে হারিয়েছে কিন্তু ইভা এবং তার সন্তানকে যেমন করে হোক সুরক্ষিত রাখতেই হবে।

তিনি রবার্টকে বললেন পেয়িং গেস্ট এর ব্যাপারটি এখনই কাউকে ঘুনাক্ষরেও কাউকে না বলে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে যেন এটাই বলে যে ম্যাডামের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়া এসেছেন কিছুদিনের জন্যে।বোধহয় অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যেই ইভা যে অন্তঃসত্ত্বা একথাটিও রবার্টকে এখনই জানানোর প্রয়োজন মনে করলেন না মিসেস শার্লট গিবসন।

বহুদিন বাদে,ইভাকে নিয়ে মিসেস শার্লট এলেন লরার ঘরে, বললেন "এ ঘরটিতে আলো বাতাস অনেক বেশি আমার মনে হয় তুমি এ ঘরটিতে অনেক বেশি সুস্থ থাকবে ।" মিসেস শার্লটের মনে এক অদ্ভুত ভালো লাগা ছেয়ে গেল যদিও তিনি জানতেন যে, ইথেন যেদিন আসবে ইভাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেদিন ওকে ছেড়ে দিতেই হবে, তবুও একাকী এক সন্তান হারানো বৃদ্ধার পক্ষে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, একটিবারের জন্য নিজের সন্তানকে ইভার মধ্যে ফিরে পাওয়ার যে আকুলতা তা যেন সব রকমের যুক্তিতর্ককে বন্যার জলের মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ইভার প্রতি এক অদ্ভুত মায়া জড়িয়ে পড়লেন ম্যাডাম শার্লট। ইভাও অনেকটাই মানিয়ে নিলো নিজেকে নিজের সঙ্গে। ক্রমশ একটি একটি করে দিন এগোতে লাগলো বরফের ধূসরতা সরিয়ে আবার সবুজের ছোঁয়া দেখা দিল ভাইন স্ট্রিটের উইলো ট্রি গুলোতে। এমনই একটি রোদ-ঝলমল দিনে ইথেন ফিরে এলো, জানালো ইভাএবং তার থাকার সব রকমের ব্যবস্থা সে করেছে। এখান থেকে কিছু দূরেই পাম এভিনিউতে একটি বাড়ি ভাড়াও করেছে। যদিও মিসেস শার্লট একবার বললেন যে সেরকম কিছু হলে আরো কিছুদিন ইভা থেকে যেতে পারে, কিন্তু ইথেন রাজি নয় সে জানালো আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যাপারটা সে খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চায়, এবং মিসেস শার্লটের জন্য তারা সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ তাই তারা মিসেস শার্লটকে নিজেদের বাড়িতেই তাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের আমন্ত্রণ দিতে চায়।
ইভার চোখে মুখের সেই সময়ের আনন্দ মিসেস শার্লটের ইভার সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্তটিকে কিছুটা ভালোলাগায় ভরে দিয়ে গেল বৈকি।
ইথেন নতুন বাড়ির ঠিকানার একটি কার্ড মিসেস শার্লটকে দিয়ে জানালো যে খুব তাড়াতাড়ি মিসেস শার্লট তাদের তরফ থেকে আমন্ত্রণপত্র পাবেন। বহুদিন বাদে প্রেমিক-প্রেমিকার নিজেদের কাছে পাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করলেন মিসেস শার্লট ইভা আর ইথেনকে দেখে। আর তাকিয়ে থাকলেন সেইদিকে যতক্ষণ না ধীরে ধীরে ইথেনের গাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে যায়।

তার পর ফিরে এলেন ইভার ঘরে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করলেন কিছুক্ষণ , ভাবলেন লরার কিছু দামি পোশাক এখনো একই রকম ভাবে কাপবোর্ড এ পড়ে আছে যেদিন উনি যাবেন সব ইভাকে দিয়ে আসবেন।
এরপরে একটি করে দিন যায় ইথেন আর ইভার একটা খবরের আশায় থাকেন মিসেস শার্লট কিন্তু তাদের কোনো খবর আর আসে না। প্রায় এক মাস অপেক্ষা করার পর একদিন রবার্টকে জানালেন তিনি যাবেন ইভার সাথে দেখা করতে তাই রবার্ট যেন গাড়িটিকে ধুয়েমুছে সঠিক ভাবে পরিষ্কার করে রাখে। সঙ্গে এও জানালেন ইভা নিশ্চয়ই তাকে ছাড়তে চাইবে না, কিন্তু এত গাছগাছালি ছেড়ে তার পক্ষে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় তাই সে বেশি জোরাজুরি করলে হয়তো একটি রাত উনি থেকেই যাবেন ওদের কাছে, কিন্তু পরের দিনই ফিরে আসবেন। রবার্ট যেন সেই মতই সব ব্যবস্থা করে রাখে।

মিসেস শার্লট আজ খুব ব্যস্ত নিজের হাতে বানালেন হেজেল নাট অ্যাপ্রিকট ক্রিম কেক সেই একই গন্ধে গোটা বাড়ি যেন আজও ম ম করছে।
দুপুর দুপুর সুন্দর একটি পোশাক পড়ে অবশেষে রওনা হলেন ইথেন আর ইভার বাড়ীর দিকে।ইথেনের দেওয়া card টি সঙ্গে নিয়ে। পৌছলেন যখন, তখন প্রায় সন্ধ্যে রবার্টকে পার্কিং প্লেস এ গাড়ি রাখতে বলে কেকটা হাতে নিয়ে এগুলেন নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। কিন্তু এনকোয়ারি ইউনিটে গিয়ে জানতে পারলেন ওই নাম্বারের বাসিন্দা যারা তাদের আজ ম্যারেজ পার্টি চলছে কমিউনিটি হলে। তিনি চাইলে সেখানে যেতে পারেন। খুব শ্রান্ত পায়ে মিসেস শার্লট এগোলেন কমিউনিটি হলের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে কাঁচের দরজার বাইরে থেকে দেখলেন সাদা বিয়ের পোশাকে ইভাকে। কি সুন্দর লাগছে ওকে, ওদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই কে নিয়ে যেন আনন্দের বন্যায় ভেসে গেছে ইথেন আর ইভা। না, মিসেস শার্লট নিজেকে কোথাও খুঁজে পেলেন না সেখানে, হাতের কেকটি এনকোয়ারি ইউনিটে দিয়ে,অনুরোধ করলেন যাতে সেটা নবদম্পতির হাতে উপহার হিসেবে পৌঁছে দেওয়া হয়। এক মহুর্তে যেন চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেল মিসেস শার্লটের। চশমাটা খুলে নিজের স্কার্ফ দিয়ে চোখটি মুছলেন বার কয়েক, গাড়িতে ফিরে রবার্টকে জানালেন, শরীরটা ঠিক নেই,বয়স হচ্ছে তো। তাই আজই ফিরে যাবেন। আর মনে মনে চোখ বন্ধ করে ইভা আর ইথেনের উদ্দ্যশ্যে বললেন ওদের ভালো হোক,

গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড।

মিডিয়ানামা

--অনিন্দ্যকেতন গোস্বামী, ভারত

—বলুন কি জানতে চান?
—নব নির্বাচিত মহিলা এমেলে হিসেবে আপনার নিজের কেন্দ্র আপনার কেমন লাগছে?
—মেয়েদের আবার ভালো মন্দ বাপু...
—কেন এ কথা বলছেন ম্যাডাম?
—আরে বাবা, কুড়ি বছর একটানা 'বাপের পরিবেশে', আবার বিয়ের পর 'শ্বশুর পরিবেশ'। মাঝে বাড়ি বদল হলে তো কথাই নেই হাওয়া বদলের মত। শুধু নব নব পরিবেশ আর নব নব মানিয়ে নেওয়া। এ কেন্দ্রটিও আমায় মেনে নেবে নিশ্চই।
—কেন, আপনি কেন্দ্রটিকে মানিয়ে নিতে পরবেন না?
—এই তো, কথায় শুধু প্যাঁচ ফেলেন। উলের মতন। মানিয়ে নেওয়াটার দুটো পার্ট হয় বুঝলেন? নির্বাচনের আগে কেন্দ্রকে আমি মানিয়ে ছিলাম। নির্বাচনের পর কেন্দ্র আমায় মানিয়ে নেবে। হারলে তো এক্সটিংক্ট করেই যেতাম। তখন অবশ্য অন্য কথা।
—কেন্দ্র আপনাকে মানিয়ে নেবে, আই মিন কেন্দ্রের লোকজন আপনাকে মানিয়ে নেবে ?
—অবশ্যই। শ্বশুর বাড়িতে যেমন নতুন বৌ কে গ্রো করবার পরিবেশ দিতে হয়। এ্যাকোমোডেশনের জন্য টাইম দিতে হয়। তেমনি আমাকেও দিতে হবে।
—শ্বশুর বাড়ির সাথে আপনার নির্বাচিত ক্ষেত্রের তুলনা করা যায় কি?
—যায় না? আমি তো মনে করি বহাল তবিয়েতে যায়। আমার বাড়ি বেহালা কেন্দ্রে। আমাকে এনে দাড় করিয়ে দেওয়া হল গোবিন্দপুরে। শ্বশুরবাড়ির মতনই। তীক্ষ্ন নজর রাখবেন। দেখবেন এখানে সবাই আমার পেছনে ননদ শাশুড়ি শ্বশুরের মত এক জোড়া করে চোখ পেতে রেখেছে। ভুল হলেই অক্টোপাশের মতন খপ্পাত করে চেপে ধরবে। তবে আমি বাপু টু শব্দটি করছিনে। ঐ শেয়ালের মতন। কাককে গ্যাস খাওয়ালেও কিচ্ছুটি কাঁ কাঁ করবো না।
—না না ম্যাডাম জনগণের কাছে কোনো কথাই কিন্তু চাপা থাকে না।
—অত চাপাচাপির প্রশ্নই বা আসছে কেন বলেন দেখি? সবাইকেই ঠাণ্ডা করবো। শীতকাল আসতে দিন। সবার চাওয়া পাওয়া তো একসাথে মেটাতে পারবো না।
—কেন ম্যাডাম? শীতকাল আসলে কী হবে?
—বোঝেন না কেন? শীতকাল হলো যে কোনো পলিটিক্যাল ম্যানদের আদর্শ পলিটিশিয়ান হওয়ার আদর্শ সময়। ঝড় ঝাপটা নেই। জল বন্যা নেই। বাড়ি ভাঙা বা তাবু নিয়ে কাবু হওয়ার বিষয় নেই। রাস্তা নিয়ে কেউ সস্তা মাথা ঘামাবে না। শুধু একটু কম্বল দান করলেই হলো। একটা কথা মনে রাখবেন, নেতাদের কম্বলই সম্বল। কাউকে কম্বল দিয়ে অন্তত বলা যায়, কথা কম বল...তাতে সমাজ ও নিজের একসাথে সেবা করা যায়।
—কিন্তু আপনি বিগত বারেও এমেলে ছিলেন। কানাঘুষোয় শোনা যায়, গতবারে উন্নয়ন মূলক কোনও প্রজেক্টেই আপনি হাত দেননি। তাহলে ঠান্ডা করবেন কি করে?
—আমার কথাটাই বোঝেননি ইয়ংম্যান। প্রজেক্ট টোজেক্ট নিয়ে বগলদাবা করে একবারে ফ্রিজে ঢুকলে সবই তো ঠান্ডা। সবই তো ফ্রিজ!! প্রজেক্টও ফ্রিজ হয়ে যায়।
হো হো করে হেসে উঠলো নব সাংবাদিক—আপনার তীক্ষ্ন হিউমার জ্ঞান দিদি
—ঠিক ঠিক। আমি মনে করি হিউম্যান হলেই হিউমার থাকতে হয়। না হলেই মার মার চরিত্র মানে মর্মর চরিত্র হয়ে যায় আরকি! বিরোধীদের যা নেই। তাদের সবই তো মর মর অবস্থা।
—এ প্রসঙ্গে বলি, বিরোধীরা আপনার কাছে কি আশা করতে পারেন ম্যাম?
—তারা নিজেরাই তো একেক পিস নিরাশা। তারা আবার আমার কাছে আশা করবে কি? তবে কুছ আচ্ছে 'বাত' আশা করতেই পারেন মানে 'বাতাসা'। আগামী দিন চৌমাথায় শনিপুজো দেবো, বাতাসা খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইলো তাদের। দশা কেটে যাবে।
—আগামী দিনগুলোতে কি কি প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার ইচ্ছে আছে আপনার?
—'মোবাইল এ্যান্ড সেলফি' প্রজেক্ট...
—এটা কেমন প্রজেক্ট ম্যাডাম?
—এখন যুগটাই তো ডিজিটাল। অনলাইনে এ্যাক্টিভ থাকা চাই। বুঝলেন না ? প্রত্যেক ঘরে ঘরে সেলফি পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সেলফিটা ঠিক কুলফির মতনই। ওতে জনগণের মগজ ঠান্ডা থাকে। প্রত্যেকে তার মোবাইলে ঘনঘন আমার মুখটা দেখলে ভাববে, ম্যাডাম নির্বাচনে পাশ করে আমার পাশেই আছেন।
—সেই কারণেই কি সেলফি?
—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই যে বললাম কাল সেলফি দেবো। শনি মন্দিরে ফুল নিয়ে হাতে। এতে ধার্মিকেরা বড় শান্তি পাবেন মনে। পরশু ধানের জমিতে ধান রোপনের সেলফি আছে। কৃষকসমাজ আমাকে ভোট দিয়েছে যে। তরশু একটা ফল মান্ডিতে ফেরিওয়ালার সাথে আম বিক্রির সেলফি নেবো। হকার্স ইউনিয়ন গড়তে হবে আগামীতে। অবশ্য আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি পরপর ছ'মাস এই রকম সেলফি প্রজেক্টেই ব্যস্ত থাকবে।

—ম্যাডাম, এ তো দেখছি সেলফি প্রজেক্টে কোনও কানাকড়িও খরচা হবে না আপনার। তাহলে কেমন জনসেবা হলো?
—হলোই তো। কানাকড়ি খরচা না করে লোককে যথেষ্ট কানা করে রাখার নামই তো 'ম্যান্ডেট'। মানে উপর থেকে আমাদের নির্দেশ আছে, বুঝলেন? প্রজেক্ট অফ উইদাউট ফিন্যান্স এ্যান্ড উইথ ডিমান্ড। মানুষের ডিমান্ড অনুযায়ী নিজেকে 'ঘর ঘর কি কাহানি' করে তুলতে হবে। সেই জন্যে চাই মিডিয়া পাওয়ার। মাঝে মাঝে লাইভ টেলিকাস্ট। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, লাইভ, টুইটারে, সেলফিতে সব জায়গায় কেল্লামাৎ করতে হবে। কাজ নয়, নিজেকে কেজো করে তুলতে হবে নিত্য নতুন বিতর্কে। এক বিতর্ক থামবে তো কাঁকড়ার ঠ্যাঙ কামড়ানোর মতন আরেক বিতর্ক উঠে আসবে। সবাই যাতে ভুলে যায় খাবার নয় খবরই আসল। সবার মুখে মুখে সরপুরিয়া নয়, সরগরম করে রাখতে হবে নেট দুনিয়া। আমার ইমেজ নেটে যত নিলাম হবে ততই মনে কর ফান্ড থেকে আমিও কিছু নিলাম। জনগনও কিছু নিল।

—জনগণ কি নিল ম্যাডাম?
—ওটা 'নিলো' উচ্চারণ করলে হবে না বোকা সাংবাদিক। করতে হবে 'নিল'। মানে জনগণও Nill। মানে শূন্য।
—আর আপনার 'নিলাম তত্ত্ব' ?
—আরে ইমেজ 'নিলাম'এর সাথে আমি 'নিলাম'এর ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক। নেটে আমার ফেস যত নিলাম হবে তার সাথে সাথে আমারও কিছু পাওনাগন্ডা বাড়বে। বুঝলেন কিছু?
—ঠিক আছে ম্যাডাম। আমাদের মিডিয়াতে এই সাক্ষাৎকার ভারচ্যুয়ালি প্রকাশ পাবে। কারণ আমাদের সম্পাদক আরো কিছু কথা অনলাইনে শুনতে চান আপনার কাছ থেকে।
হঠাৎ করেই 'ভারচ্যুয়ালি' শব্দ শুনে ম্যাডামের নিচের চুয়াল ভার হয়ে এলো—সেই তো, আমি কিন্তু ভুলেই গেছিলাম। আপনার ওটা শুধু মোবাইলই নয়। মিডিয়া। এখন তো হাতে হাতে মিডিয়া। আমরা সবাই মিডিয়া... আমাদের এই মিডিয়া রাজত্বে... নইলে মোরা মিডিয়ার সাথে মিলবো কি শর্তে... আমরা সবাই মিডিয়া... এই শোন হে ছোকরা, এতক্ষণ ধরে আমি যা যা বলেছি সবই কিন্তু ফান। অগণিত ফ্যান-ফলোয়ার আছে বলেই তো মাঝেমধ্যে ফোনে একটু ফান করতে হয়, বোঝ না ? ম্যাডাম ট্যারাচোখে মুচকি হাসলেন। ট্যারাচোখ আসলে ট্যাকল বাই ট্যাকটিস।

গন্তব্য ছিল অস্ট্রিয়া

--অজন্তা বসু,বেলজিয়াম

সবে এক মাস হয়েছে তখন বেলজিয়াম এ এসে | হাওড়ার সেই জহরালয়ের চৌকাঠ পেড়িয়ে প্রথম ভিনদেশে পারি | দয়া করে, জহরালয় কে কোনো প্রাসাদ ভেবে ভুল করবেন না| ওটা একটা বহু প্রাচীন বাড়ির নাম | না না , ভুল করছেন আরও, এটি কোনো রাজা রানীর ও গল্প নয় | এটি একটি সহজ সরল ভ্রমণ গাঁথা | সেই অজপাড়াগাঁয়ের চশমা চোখের মেয়ের প্রথম বিশ্বের (নেহাত ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি না বলে একটু বেশি ই বাংলা বল্লাম, ভুলত্রুটি মার্জনা করিবেন) দেশে পদার্পন| তার জেদ অদম্য, ভীতসন্ত্রতো মনের মধ্যেও আলোর বেগে ছোটার ইচ্ছে | অগত্যা কাজের ফাঁকে সে শুরু করে দিলো তার ইউরোপ মহাদেশে ভ্রমণের পরিকল্পনা | সালটা ছিল ২০১৮| তাই প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের আগে থেকেই বলে রাখি মুখমণ্ডলের ওপর এখনকার সব থেকে জরুরি অলংকার 'ফেস মাস্ক' টা তখন কিন্তু দরকার হতো না |

একা এর আগে কখনো কোথাও সে ঘুরতে যায়নি| হাওড়া তে থাকাকালীন শুধু গঙ্গার ওপারে মহানগরী তে যাতায়াত ছিল কর্মসূত্রে| অগত্যা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার ব্যাপার টা তার কাছে মোটেই সহজ ছিল না | উপরন্তু, তার কলিকাতার সহকর্মীদের কারোর ই এখনো অবধি ভাগ্যচক্রে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়ে ওঠেনি | একজন দাদা মাস দুয়েক আগে বেলজিয়াম এ পদার্পন করেছেন কিন্তু তার ও কিনা বৌ বাচ্চা নিয়ে বিদেশ বিভুঁই এ থাকা | সুতরাং, তার কাছে এ মুহূর্তে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপার টা খরচা সাপেক্ষ | অগত্যা, মেয়েটি স্থির করলো একা ই যাওয়ার| আপাতত, বেলজিয়াম এ তার আস্তানা একটি সার্ভিস আপার্টমেন্ট| আগেই বলে দি, যারা বিদেশে থাকা টা কে খুব রাজকীয় ব্যাপার মনে করেন, সেটি কিন্তু খুব একটা সত্যি না | এখানে, বিশেষত, ইউরোপের দেশ গুলিতে বাড়ির মাস কাবাড়ির ভাড়া যা তাতে আপনি দু তিনটে ইউরোপিয়ান দেশ ঘুরে আসতে পারবেন |

বাকিটা আর বিস্তারিত ভাবে বললাম না | তাহলে আর ভ্রমন গাঁথা টা আর লেখা হবে না মশাই | যাই হোক, তো মেয়েটি তার রুমমেটের কাছ থেকে জানতে পারলো যে এখানে একটি ভারতীয় সংস্থা আছে যারা আপনার ভ্রমণের থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আপনার পরিভ্রমনে সহায়তা করবে | এবার একটু ইংরিজি বলি, সংক্ষেপে মশাই এই সংস্থা টি হলো একটি টুর অর্গানাইজার | ব্যাস! আর দেরি করে কে| আল্হাদে আটখানা হয়ে মেয়েটি তাদের ওয়েবসাইট থেকে কয়েকটা ট্রিপ দেখে ফেললো| তার চোখ পড়লো নভেম্বর এর একটি ট্রিপ এ | "অস্ট্রিয়া" | আর যাই হোক এই মেয়েটির কিন্তু অন্যদের মতো 'প্যারিস' আর 'সুইজারল্যান্ড'এর প্রতি অতটা মোহ ছিল না | হ্যাঁ, বলতে পারেন, গতানুগতিক ভারতীয় ধারার থেকে একটু ব্যাতিক্রম |

গুগল এ কিছুদিন অস্ট্রিয়া নিয়ে ঘাটাঘাটি চলতো তার কাজের অবসরে | সে জানতে পারলো যে অস্ট্রিয়া বেড়াতে যাওয়ার জন্য নভেম্বর মাসটি একদম আদর্শ সময় | এই সময় অস্ট্রিয়ার গড় তাপমাত্রা থাকে তিন ডিগ্রী থেকে সাড়ে আট ডিগ্রির মধ্যে | তাই আর দেরি না করে সে ট্রিপ টির বুকিং করে নিলো | এখন দরকার একটি উইন্টার জ্যাকেটের | কলকাতা র পচা গরমএ অভস্থ্য মেয়েটির এটি একটি অত্যাবশ্যক হাতিয়ার এখানে হিমশীতল জলবায়ু তে টিকে থাকার | তাই আর দেরি না করে সার্ভিস আপার্টমেন্ট এর পিছনের শপিং স্ট্রিট থেকে তড়িঘড়ি করে একটি জ্যাকেট কিনে আনলো সে | এই শপিং স্ট্রিট এর ব্যাপার টা বেশ মজার | ইউরোপের প্রতিটি শহরে আপনি একটি রাস্তা খুঁজে পাবেন যেখানে রাস্তার দু পাশে ছোট বড়ো নামকরা ব্র্যান্ডের দোকান | আরে হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, আমাদের ধর্মতলার একপ্রকারের রাজকীয় রূপ |

নভেম্বর মাসের সকাল | কনকনে ঠান্ডা | রাতে ঘুম আসেনি তার | সকালে উঠে একটু সাজুগুজু করার জন্য মেকআপ বাক্স টা ঠিক করতে আর কি কি কাপড় জামা নিয়ে যাবে সেসবের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতেই রাত কাবার | কন্ট্যাক্ট লেন্স ও পড়ার চিন্তা ছিল সকালে উঠে | তাই ঘুম আর কি হবে ! ভালো ভাবে রেডি হয়ে দু একটা সেলফি তুলে রওনা দিলো সে বাস স্ট্যান্ড এর দিকে | এই টুর অরগ্যানিসের আয়োজন দেখে সে তো বেশ খুশি | একটি ডাবল ডেকার বাস আর তার মধ্যে ছোট খাটো একটা প্যান্ট্রির আয়োজন আছে, যেখানে আপনি রেডি টু ইট খাবার পেয়ে যাবেন আর সব থেকে জরুরি কাজের জন্য একটি ইমার্জেন্সি টয়লেট | এখানে সবাই টয়লেট কে WC বলে| যাই হোক, তার মানে হলো যে, জল বেশি খেলেও আপনার এ যাত্রা এ চাপ নেই| কিন্তু বাসে উঠে সে জানতে পারলো যে সবার শেষের বুকিং টি ছিল তার | তাই বাস এর একেবারে শেষের দিকের সিট টি তে তার স্থান | যদিও কলকাতার ভিড় বাস এ যাতায়াত করে অভস্থ্য মেয়েটির কাছে এটি নেহাত ই রাজকীয় আয়োজন | দিনটি ছিল শুক্রবার | বয়স হয়েছে, তাই তারিখ টা তার মনে নেই | দয়া করে রেগে যাবেন না | বাস ছাড়লো ব্রাসেলস থেকে | গন্তব্য হলো অস্ট্রিয়ার সালজবার্গ শহর |

এবার একটু অস্ট্রিয়া দেশটির ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে বলি | মধ্য ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এই দেশটি, আল্পস পর্বতমালার পূর্ব প্রান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত | যারা আল্পস এর ব্যাপারে আগে শোনেননি , তাদের জন্য বলি, আল্পস হলো ইউরোপের বৃহত্তম পর্বতমালা যেটি বিরাজ করছে আটটি ইউরোপের দেশের উপর - ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড, মোনাকো, ইতালি , লিচটেনস্টাইন , অস্ট্রিয়া , জার্মানি এবং স্লোভেনিয়া | সুতরাং, অস্ট্রিয়া ও হলো এমনি একটি আলপাইন দেশ | যদিও অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তবুও সালজবার্গ হলো ইউরোপ ভ্রমণকারীদের জন্য অন্যতম একটি আকর্ষণ | সালজবার্গ এর অন্যতম আকর্ষণ হলো আল্পস এর স্বর্গীয় সৌন্দর্য | সালজাক নদী শহর টিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে | এর বাঁদিক টা আমাদের উত্তর কলকাতার মতন ই প্রাচীন এবং ডানদিকে দক্ষিণ কলকাতার মতো আধুনিক |
নদীর বাঁদিকে রয়েছে আল্টস্টাড বলে একটি বহু প্রাচীন জায়গা, যেটি নাকি বিখ্যাত মিউজিসিয়ান মোজার্ট এর জন্মস্থান | ব্রাসেলস থেকে সালসবার্গ বাস এ করে যেতে সময় লাগে মোটামুটি ১৪ ঘন্টা | তাই, মেয়েটির কাছে মোটামুটি এই সময়টা পর্যাপ্ত ছিল কিছু নতুন বন্ধু বানানোর জন্য |
ব্যাস আর কি, বেশ কয়েকটা নতুন বন্ধু ও হয়ে গেলো | বাসটিতে তার আশেপাশে যারা বসে ছিল, তারা মোটামুটি সবাই তার সমবয়সী | বেশ, আড্ডাও জমে গেলো | রাতটা এই ভাবে, কেটে গেলো| লাক্সেমবার্গ এ রাতের দিকে বাস টা কিছুক্ষনের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল | তারপর একেবারে বাস ছুটলো গন্তব্যের দিকে | গল্প করেই অর্ধেক টা রাত কেটে গেলো, সকালে যখন চোখ খুললো তার, টুর গাইড মিস্টার আনসারী, তখন সবাইকে জলখাবারের জন্য কেক এবং ফলের রস বিতরণ করছিলেন এবং সালজবার্গে গিয়ে ওখানের আকর্ষণীয় স্থান গুলি দেখার জন্য খরচ পাতির কথা বিস্তারিত ভাবে বোঝাচ্ছিলেন | জানা গেলো যে, সালজবার্গ এ ভ্রমণকারীদের জন্য সালজবার্গ কার্ড থাকে | এই সালজবার্গ কার্ডটি যদি আপনি কিনে নেন, তবে এটির সৌজন্যে, আপনি সালজবার্গের যেকোনো পরিবাহনের সুযোগ নিতে পারেন | এই কার্ডটি কিনতে আপনার পকেট থেকে আপনাকে নূন্যতম তিরিশ টা ইউরো দখিনা দিতে হবেই | তারপর যত বেশি দিন আপনি এটিকে ব্যবহার করবেন, তার উপর ও আপনার কার্ডটির মূল্য নির্ভর করবে | অগত্যা, এই বহুমূল্য কার্ডটি কে দয়া করে হারাবেন না |

সকাল তখন ৯ টা হবে, বাস এসে পৌঁছলো সালজবার্গ শহরে | বাস থেকে নামতেই, আল্পসের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য দেখে মেয়েটিতো আশ্চর্যনিত্য হয়ে গেলো | চারিদিকে ছোট বড়ো সূর্যস্নাত গাছের সারি আর তার মাঝে উঁকি দিচ্ছে সালজকাম্মেরগুত পর্বতমালা | কলকাতায় থাকতে মেয়েটির কোনোদিন দার্জিলিং এই যাওয়া হয়নি| সেখানে সে যখন, প্রথম চাক্ষুষ আল্পস দেখছিলো, তার মনে পড়ছিলো ছোটবেলায় ক্যালেন্ডার এ দেখা সেই ছবি গুলি অথবা সে হয়তো ভাবছিলো তার মোবাইল অথবা ল্যাপটপ এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ওয়ালপেপার গুলির কথা | এটা স্বপ্ন না সত্যি সেটা বোঝার জন্য একবার নিজেই নিজেকে চিমটি কেটে পরখ করলো সে | ইতিমধ্যে তার কানে এলো, বাঙালি কণ্ঠস্বর | দুটি ছেলে বাস থেকে নেমে একে ওপরের সাথে বাংলায় কথা বলছিলো | এতক্ষন পর্যন্ত মেয়েটি যেসব বন্ধু পাতিয়েছিলো, তাদের কেউ ই বাঙালি ছিল না | সুতরাং এতদিন পর, বিদেশ বিভুঁই এ, বাংলা কণ্ঠস্বর শুনে, সে লাফাতে লাফাতে তাদের সাথে আলাপ করতে গেলো | ইতিমধ্যে মিস্টার আনসারী, হোটেলের রুমের আয়োজন করে ফেলেছেন | সবাইকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমরা সবাই রওনা দেব সালজবার্গ পরিভ্রমণের জন্য | সেটা শুনে সবাই যে যার হোটেল রুমের চাবি নিয়ে, তড়িঘড়ি করে জিনিসপত্র রাখতে চলে গেলো |

প্রথম গন্তব্য ছিল মিরাবেল প্যালেস | প্রিন্স আর্চবিশপ এই সুন্দর প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তার ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে | প্যালেসের ভেতরে একটি খুব প্রাচীন সুন্দর উদ্যান আছে যেটি প্রথম ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে বানানো হয়েছিল | এখনো বাগান টির শান্ত শীতল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে | বাগান টিতে চারটি ভিন্ন প্রাচীন মূর্তি আছে যেগুলি অগ্নি, বায়ু, পৃথী এবং জলের প্রতীক | এই বাগানটি ফটোগ্রাফারদের জন্য অন্যতম সেরা আকর্ষণ |
মিরাবেল প্যালেসর পর পরবর্তী গন্তব্য ছিল হেলব্রুন প্যালেস এবং ট্রিক ফাউন্টেন | ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে বারোক শিল্পকার্য খুব বিখ্যাত ছিল | এই বারোক শিল্পকার্যের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো হেলব্রুন প্যালেস | হেলাব্রুন প্যালেসের পর দলটির ওই দিনের শেষ দুটি গন্তব্য ছিল - উন্টারসবার্গ (এটিকে ঠিক পর্বত বলা ভুল হবে | এটি অনেকটা পাহাড় বা মালভূমির মতো যেটি জার্মানির বাভারিয়া আর অস্ট্রিয়ার সালজবার্গের মাঝে অবস্থিত | উন্টারসবার্গের মার্বেল ইউরোপে তথা বিশ্বে বহুমূল্যের মানা হয় |)

মিরাবেল প্যালেসর পর পরবর্তী গন্তব্য ছিল হেলব্রূন প্যালেস এবং ট্রিক ফাউন্টেন | ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে বারোক শিল্পকার্য খুব বিখ্যাত ছিল | এই বারোক শিল্পকার্যের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো হেলব্রূন প্যালেস | হেলাব্রূন প্যালেসের পর দলটির ওই দিনের শেষ দুটি গন্তব্য ছিল - উন্টারসবার্গ (এটিকে ঠিক পর্বত বলা ভুল হবে | এটি অনেকটা পাহাড় বা মালভূমির মতো যেটি জার্মানির বাভারিয়া আর অস্ট্রিয়ার সালজবার্গের মাঝে অবস্থিত | উন্টারসবার্গের মার্বেল ইউরোপে তথা বিশ্বে বহুমূল্যের মানা হয় |), হোহেনসালজবার্গ দুর্গ (এই দুর্গটি তৈরী হয়েছিল ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি মিলিটারি ব্যারাক আর কারাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হতো |) | হোহেনসালজবার্গ দুর্গের উপর থেকে দেখা সালজবার্গের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায়না | মেয়েটি যখন দুর্গের চূড়া থেকে দূরের পর্বতমালার মাঝে সূর্য টিকে ডুবতে দেখছিলো, চোখের কোনায় তখন তার মুক্তের মতো অশ্রু গুলি তাকে মনে করাচ্ছিল তার এতগুলি বছরের কঠোর পরিশ্রমের সার্থকতা | এর সাথেই প্রথম দিনের পরিভ্রমণ শেষ | আর একটি মাত্র দিন বাকি | তারপর ফিরে যেতে হবে আবার কর্মজীবনের ব্যস্ততায় |
দুর্গ থেকে ফেরার পথে , দলটি রাতের নৈশভোজ সারার জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলো | মেয়েটি তার নতুন বন্ধুদের সাথে একটি ভারতীয় রেস্তোরায় গেলো নৈশভোজ সারতে | তারপর কিছুটা সময় বাঁচিয়ে লকব্রিজের উপর ঘোরাফেরা করলো এবং কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দি করলো | ও হ্যা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম তাদের দিনের শেষের আরেকটি গন্তব্য ছিল মোজার্ট এর জন্মস্থান | এই বাড়িটি তেই জন্মেছিলেন বিখ্যাত মিউজিসিয়ান মোজার্ট (২৭ জানুয়ারী, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে) | ছোটবেলার সেই টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল ষ্টার গানটি মনে পরে ? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ওটার আসল গান তার রচয়িতা ছিলেন এই বিখ্যাত সুরকার | পুরো বাড়িটি জুড়ে তার সমস্ত অনবদ্য সৃষ্টি র স্মৃতিচারণা | মেয়েটি ভাবতেই পারেনি কোনোদিন মোজার্টের বাড়িতে বসে তার লেখা সুর গুলির রেকর্ডিং শুনবে |

পরের দিন সকাল ১১ টার দিকে জলখাবার সেরে সবাই সালজবার্গ থেকে রওনা দিলো | বিদায় সালজবার্গ | পরের গন্তব্য হলস্টেট |
এবার একটি হলস্টেট জায়গাটির ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে বলি | হলস্টেট হলো হলস্টেট লেকের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম | ষোড়শ শতাব্দীর সুন্দর আলপাইন ঘর গুলি আর এখানে প্রত্যেকটি গলিতে পুরাতন ক্যাফে গুলির সৌন্দর্য সত্যিই নজর কাড়ে | আর হলস্টেট লেকের নিস্তব্ধতা, রাজঁহাস গুলির ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর লেকটিতে সালজকম্মেরগুত পর্বতমালার প্রতিচ্ছবি দেখে মেয়েটির যেন সত্যিই মনে হচ্ছিলো, "বিপুলা এ পৃথিবীর কত টুকু জানি.." | এই গ্রামে একটি ফানিকুলার (তারে চালিত) রেলওয়ে আছে যেটিতে করে যাওয়া যায় সালজভেল্টেন | এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি বহু প্রাচীন লবণের খনি | আর এখানেই রয়েছে বহুপ্রাচীন একটি ভূগর্ভস্থ লবন হ্রদ | এবং সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হলো এখানকার স্কাইওয়াক |
দলটি যখন হলস্টেট পৌঁছলো দুপুর তখন ১২ টা হবে | দলটি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো গ্রামটি কে ঘুরে দেখার জন্য | যারা বয়স্ক ছিল, তাদের কে বাদ দিয়ে মোটামুটি যারা যুবক যুবতীর দল ছিল তারা ফানিকুলারে চড়ে চললো স্কাইওয়াক আর ৭০০০ বছরের পুরোনো লবণের খনি দেখার জন্য | লবণের খনি তে প্রবেশের জন্য আলাদা ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছিল সবাইকে | যারা আরেকটু রোমহর্ষক অভিজ্ঞত্যার জন্য অপেক্ষা করছিলো, তাদের কে জানানো হলো খনির ভেতরে একটি ট্রেইল আছে | যেটিতে করে তারা খনির আরো নিচে যেতে পারবে | মেয়েটিও চললো অতি উৎসাহের সাথে তার নতুন পাতানো দুটি বাঙালি বন্ধুর সাথে | লবণের খনি টির ব্যাপারে আর বিস্তারিত ভাবে না হয় পরে বলবো আরেকদিন | তবে মেয়েটির কাছে এটি ছিল সাক্ষাৎ টাইম ট্রাভেল | লবণের খনিটির ভিতরে বর্ণিত আছে চারটি যুগের মধ্য দিয়ে সময়ের একটি উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রা | অবশেষে দেখা মিললো এচেরন উপত্যকার এবং গ্লেসিয়ার গার্ডেনের (বাংলায় হিমবাহ বাগান বলতে পারেন) | লবন খনির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পরের আকর্ষণ ছিল স্কাইওয়াক | হলস্ট্যাটের বার্ডস আই ভিউ যদি উপভোগ করতে চান তাহলে এটির দর্শন অতি আবশ্যক | স্কাইওয়াকের প্ল্যাটফর্মটি পাহাড় থেকে ১২ মিটার এবং মাটি থেকে ৩৬০ মিটার উপরে প্রসারিত। এটির অভিজ্ঞতা বলে বোঝানো মুশকিল | ইউনেস্কো সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যের কমিটি এর ব্যাপারে লিখেছেলো : "... বৈজ্ঞানিক আমদানির সাথে অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রকৃতি যুক্ত হয়েছে ..." |
নভেম্বর মাস | তাই সন্ধ্যাটা একটু তাড়াতাড়ি নামলো | বিকেল তখন ৫টা হবে | এবার ফেরার পালা | হলস্টেট লেকের গায়ে লেগে থাকে ছোট ছোট আলপাইন বাড়িগুলো তে ধীরে ধীরে আলো জ্বলতে শুরু করলো | সেই আলো আধারির রঙে রাঙানো প্রকৃতির অপূর্ব ক্যানভাস দেখে মেয়েটি মনে মনে বললো "আবার আসিব ফিরে..." ||

"বাবর - ই - হান্ডি"

--সুমনা দে মল্লিক, বেলজিয়াম

মাংসের এই পদটি প্রথম খেয়েছিলাম মায়ের কাছে অনেক বছর আগে। তখন আমি পড়ুয়া, স্কুল না কলেজ তা আজ আর মনে নেই। রান্নাটাকে তখনকার সেই কিশোরী মেয়েটা অন্য মাংসের পদ এর থেকে সেভাবে আলাদা করতে না পারলেও রান্নার নামটা মনে গেঁথে গিয়েছিল,'বাবর ই হান্ডি'। সত্যি বেশ অন্যরকম নাম, সচরাচর এই নামে কোন মোঘলাই খাবার শোনা যায় না। আর যা বিরল বা uncommon, তার প্রতি আমার আকর্ষণ চিরকালের; এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। তাই পরবর্তীকালে যখন নিজে রান্নাবান্না শুরু করেছি, এবং আরো পরবর্তীতে সেগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি প্রথমেই মনে এসেছে এই 'বাবর ই হান্ডি'র নাম। এই রান্না সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় এটি মুঘল সম্রাট বাবরের অত্যন্ত পছন্দের একটি পদ এবং আমরা সবাই জানি মুঘলদের খাবারের মধ্যে মাংস সব সময় অত্যন্ত পছন্দের উপকরণ ছিল। তখন রান্না হতো কাঠের জ্বালে আর মুঘল সম্রাট বাবর পছন্দ করতেন হাঁড়িতে তৈরি এই বিশেষ মাংসের পদটি।অনেকক্ষণ ধরে ঢিমে আঁচে হাঁড়িতে করে এই পদটি তৈরি হতো;তাই তার স্বাদও হতো অনন্য। এসবই কথিত, এর কোন নির্দিষ্ট দলিল খুব একটা পাওয়া যায় না, তবে তাতে অসুবিধে নেই। পদটি কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু। এর বিশেষত্ব হল এখানে টক ও মিষ্টি দুই রকম দই ব্যবহার হয় আর এটাই পদটিকে অনন্যসাধারণ করে তোলে। এখনকার দিনে সময়ের অভাবে আমরা হাঁড়ির পরিবর্তে প্রেসার কুকারে করতে বাধ্য হই, তবে তাতেও এর স্বাদ অসাধারণ।

উপকরণ:-

মুরগীর মাংস - ৫০০ গ্রাম
পেঁয়াজবাটা - ১টা বড়ো
রসুন বাটা - ১ চা চামচ
আদা বাটা - ১চা চামচ
টক দই - ১/২ কাপ
মিষ্টি দই - ১/২ কাপ
ধনে গুঁড়ো - ১চা চামচ
লবণ - স্বাদমতো
চিনি - এক চিমটে
শুকনো লংকা - ২/৩ টে গোটা
গোলমরিচ - ৮/১০ টা গোটা
জয়িত্রী - ২টি পাপড়ি
লবঙ্গ - ২/৩ টে
ছোট এলাচ - ২/৩ টে
দারচিনি - ১"
ঘি - ২ টেবিল চামচ
সাদাতেল - ১চামচ

প্রণালী:-

পেঁয়াজ - আদা - রসুনবাটা, ধনেগুঁড়া ও দুরকম দই দিয়ে মাংস ম্যারিনেট করে রাখতে হবে ২ ঘন্টা। এবার হাঁড়িতে ঘি ও সাদাতেল দিয়ে একটু গরম হলে এক চিমটে চিনি দিয়ে গোটা মশলাগুলো দিতে হবে শুকনোলংকা বাদে। এবার ম্যারিনেটেড মাংসটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। এবার লবণ ও গোটা শুকনো লংকা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে অল্প ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে, যতক্ষণ না মাংস নরম হয়। ঢাকনা খুলে একটু শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন পরোটা, নান অথবা পোলাও এর সাথে।
রান্নাটা পুরো ঘিতেও করতে পারেন, অথবা ঘি ও সাদাতেল সমপরিমাণে ব্যবহার করতে পারেন। রান্নাটিতে অবশ্যই দুইরকম দই ব্যবহার করতে হবে, নাহলে স্বাদ ঠিকমতো হবে না।
আমি এখানে মুরগীর মাংস দিয়ে করেছি, পাঁঠার মাংসের জন্য ম্যারিনেশান আরো বেশি সময় করলে ভালো হবে।

কুমড়ো চিংড়ি

--অমৃতা রায়, সুইজারল্যান্ড

উপকরণ:-

কুমড়া/কুমড়ো:- ৫০০ গ্রাম
চিংড়ি:- ২০০ গ্রাম
আদার পেস্ট:- ১ চা চামচ
রসুনের পেস্ট:- ১ চা চামচ
পেঁয়াজ:- ২ টি সূক্ষ্মভাবে কাটা
হলুদ গুঁড়ো:- ১ চা চামচ
মরিচ গুঁড়ো:- ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো:- ২ চা চামচ
গরম মসলার গুঁড়ো:- ১ চা চামচ
ধনে পাতা:- ২ চা চামচ কাটা
পাঁচ ফোড়ন:- ১ চা চামচ
তেল:- বিশেষত সরষের তেল
চিনি:- স্বাদ অনুযায়ী
লবন:- স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী:-

চিংড়িগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে , সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে হবে। হলুদ এবং লবন দিয়ে মেরিনেট করতে হবে। এটা একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে পরিস্কার করে পরিবেশনের জন্য রেখে দিতে হবে। এবার গোটা কুমড়ো নিয়ে উপর থেকে কেটে নিতে হবে। কুমড়োর খোসা ধুয়ে, পরিষ্কার করে রাখতে হবে। একটি প্যান/কড়াই গরম করে এতে সরষের তেল দিতে হবে। চিংড়ি ভাজার পদ্ধতি অল্প হবে, কড়াইতে পাঁচ ফোড়ন দিতে হবে। যখন এটি ফাটতে শুরু করে, কাটা পেঁয়াজ দিয়ে , এটি স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।
আদা-রসুনের পেস্ট যোগ করুন এবং রসুনের কাঁচা ভাব না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। হলুদ, মরিচ গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়োর মতো মশলা দিয়ে দিতে হবে। এটি সঠিকভাবে মেশাতে হবে। কাটা কুমড়ো গুলো দিয়ে দিতে হবে। কম আঁচে অন্তত ২০ মিনিট রান্না করতে হবে।
এতে ভাজা চিংড়ি গুলো দিয়ে দিতে হবে। লবণ, চিনি এবং জল দিয়ে আরো কিছু সময় কষিয়ে নিতে হবে। কুমড়ো এবং চিংড়ি সঠিকভাবে রান্না না হওয়া পর্যন্ত এটি ঢেকে রাখতে হবে এবং সময়ে সময়ে আরও কিছু সময় ধরে রান্না করতে হবে। কুমড়া এবং চিংড়ি হয়ে গেলে, গরম মসলা এবং কাটা ধনে পাতা দিয়ে দিতে হবে।
এবার কুমড়ো-চিংড়ি পরিষ্কার কুমড়োর খোসায় রাখতে হবে এবং গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।

কমলা ভোগ

--শাশ্বতী চ্যাটার্জি, ওমান

১৮৬৮ সালে বাগবাজার নিবাসী নবিন চন্দ্র দাস প্রথম কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী রসগোল্লা তৈরি করেন। এটি এক প্রকার সুস্বাদু ছানার মিষ্টি যা বাঙ্গালির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরবর্তী কালে এই রসগোল্লার ২৭০ টি প্রকারভেদ হয়। তারমধ্যে একটি কমলা ভোগ বা কমলা রসগোল্লা নামে বিখ্যাত হয়। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এই কমলা ভোগ বাংলার মিষ্টির তালিকায় নিজস্থান স্বমহিমায় গ্রহন করে নেয়। এই ঐতিহ্যবাহী কমলা ভোগ আমার নিজস্ব পছন্দের তালিকায় বিদ্যমান। তাই আমি আমার রান্নাঘরে কিভাবে তৈরি করলাম কমলা ভোগ তা আজকে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

উপকরণ:-

- ফুল ক্রিম দুধ – ১ লিটার
- মিষ্টি কমলালেবু – ৫ থেকে ৬ টা
- কমলা ফুড কালার – ২ টেবিল চামচ
- চিনি – বড় ১ কাপ
- বড় এলাচ – ৪ টি
- সুজি এবং ময়দা – আধা চামচ প্রতিটি
- ঘি – পরিমাণ মত
- কমলালেবুর খোসার কুঁচি – ৫ গ্রাম
- মস্লিন কাপড় ছানা ছাঁকার জন্য

১ লিটার ফুল ক্রিম দুধ একটি পাত্রে নিয়ে ৫ মিনিট ধরে ফোটালাম। পাশাপাশি এই সময় ২ টি কমলালেবু কেটে রস ছেঁকে নিলাম। এখন এই কমলালেবুর রসে ১ টেবিল চামচ কমলা ফুড কালার যোগ করলাম। এবার আঁচটা কম করে নিয়ে কমলালেবুর রস ধীরে ধীরে গরম দুধের মধ্যে ঢাললাম। দুধ কেটে সুন্দর কমলা রঙের ছানা হল। এবার একটা মস্লিন কাপড় নিয়ে ছানাটা ছেঁকে সাধারণ জল দিয়ে ছানাটা ধুয়ে ১ ঘন্টা ধরে ঝুলিয়ে রাখলাম যাতে অতিরিক্ত জলটা বেরিয়ে যায়।

এবার চলুন দেখি কি করে চিনির রস বানালাম -

একটি পাত্রে বড় মাপের ৩ কাপ জল নিয়ে ২ টো কমলালেবুর রস আর ১ টেবিল চামচ কমলা ফুড কালার দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এখন বড় ১ কাপ চিনি ঢেলে আর ৪ টি বড় এলাচ যোগ করে ঢাকনা দিয়ে ফোটাতে দিলাম।
এবার মস্লিন কাপড়ে রাখা ছানাটা একটা থালায় নিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ধরে হাতের তালু দিয়ে ঘষে ঘষে নরম মোলায়েম করলাম। আধা চামচ সুজি এবং আধা চামচ ময়দা যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। হাতের তালুতে ঘি মাখিয়ে ছানার মিশ্রন থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে মসৃণ ছোট ছোট বল তৈরি করলাম। এবার চিনির সিরাপে ৫ গ্রাম কমলালেবুর খোসার কুঁচি এবং স্বাদের জন্য ১ টা গোটা কমলালেবুর কোয়া মেশালাম। এখন একটি একটি করে ছানার বলগুলি চিনির রসে দিয়ে ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। ১০ মিনিট পরে উল্টে দিয়ে আবার ঢেকে বেশি আঁচে ৩০ মিনিট ফোটালাম। দেখলাম ছানার বলগুলি আকারে দ্বিগুণ হয়েছে। এখন আবার উল্টে দিলাম এবং ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিটের জন্য কম আঁচে রান্না করলাম। গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে ঢাকনা দেওয়া অবস্থায় ৭ ঘন্টা রেখে দিলাম।
আমার এবং আপনাদের সকলের প্রিয় কমলা ভোগ প্রস্তুত হল আমার রান্নাঘরে।

"সফেদ মুর্গ্"

--অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, ভারত

আজ সকাল থেকে অনেক বার মায়ের কল এসেছে কিন্তু, আমার আর কল করা হয়নি এখন দিনের শেষে, বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে ভাবছি একবার মাকে কল করব কিন্তু এখন তো অনেক রাত হয়ে গেছে। আমাদের এখান থেকে ইন্ডিয়ার ডিফারেন্স 9 ঘন্টার , আমি এখন আছি ওয়াশিংটন ডিসি তে আর আমার বাড়ি হল ইন্ডিয়ার কলকাতা যাদবপুরে, এখন আমার এখানে বাজে আটটা তাই হিসাব করে দেখলাম তাহলে, এখন ইন্ডিয়াতে,বাজে ভোর চারটে তাই কলটা করেই ফেললাম কারণ আমি জানি মা সকালে উঠেই পরে ,কল করতেই মা বলল আমরা এখন মহালয়া দেখছি আজ মহালয়া তোর নিশ্চয়ই মনে নেই, আমি বললাম হ্যাঁ মা একটুও মনে নেই, এতো কাজের প্রেসার, পড়াশোনা ,লাস্ট সেমিস্টার তার ওপরে পার্টটাইম জব তাই আর মনে নেই, মা বলল ঠিক আছে, এবারে কবে আসছিস বল পুজোতে, আমি বললাম ঠিক আছে এখনো তো ছুটির জন্য কিছু বলিনি বললে আমি তোমাকে জানাচ্ছি,মা আবদার করে বলল আমি ওসব কিছু জানিনা প্রতিবারের মত এবারেও ষষ্ঠীতে তোকে আসতেই হবে, মায়ের কথা তো ফেলতে পারলাম না তাই বললাম ঠিক আছে আমি দেখছি, এরপর রাতেই একটা মেইল করে দিলাম ছুটির জন্য জানিনা মঞ্জুর হবে কিনা কারণ এখানে এখন খুব কাজের প্রেসার, ...

ফোনটা,রাখার পর থেকে মনটা কেমন যেন আবেগের ভরে উঠল মনে পড়ে গেলো পুরনো দিনের সেই সব স্মৃতিকথা কত না মজা আনন্দ ভরপুর ছিল সেই সময় ..... আরো একটা জিনিস যা আমার মনকে বারংবার সেই পুরনো দিনের অতীতে নিয়ে যায় সেটা হল পূজার খাওয়া-দাওয়া পুজোর সময়ে এত রকমের সুস্বাদু খাবার মায়ের হাতের আমি খেয়েছি ....যে এখনো আমি ভুলতে পারিনা..... আজ তেমনই একটি রেসিপি আপনাদের সবার সঙ্গে শেয়ার করব...

রেসিপি টির নাম হল ..."সফেদ মুর্গ"। .....
আসুন তাহলে রেসিপিটি শুরু করা যাক.....

উপকরণ:-

মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম
আদার রস চার চামচ
রসুনের রস চার চামচ
পিয়াজ বাটা তিন চামচ
শামরিচ গুঁড়ো এক চামচ
শাজিরে গুঁড়ো হাফ চামচ
ফ্রেশ ক্রিম দুই চামচ
তেজপাতা দুটো
এলাচ দারচিনি লবঙ্গ দুটো করে
কাজু বাদাম বাটা এক চামচ
চারমগজ বাটা 2 চামচ
নারকেলের দুধ হাফ কাপ
গোলাপ জল 1 চা চামচ
হোয়াইট অয়েল প্রয়োজনমতো
নুন স্বাদ অনুযায়ী
টক দই হাফ কাপ

প্রণালী:-

প্রথমেই একটি পাত্রের মধ্যে মুরগির মাংস ভালোমতো ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব তারপর তার মধ্যে টক দই, স্বাদমতো নুন, শাজিরে গুঁড়ো , শামরিচ গুঁড়ো, কাজু বাদাম বাটা, চারমগজ বাটা, গোলাপজল এবং সাদা তেল দিয়ে ভালো মত করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো দু ঘন্টার জন্য, এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তেল গরম হয়ে এলে তাতে প্রথমে তেজপাতা এবং গোটা গরম মসলা এলাচ লবঙ্গ দারচিনি দিয়ে দেবো তারপর মেরিনেট করা মাংস দিয়ে ভালোমতো করে করব কষানো হয়ে গেলে মাংসটা যখন সেদ্ধ হয়ে আসবে সেই মুহূর্তে হাফ কাপ পরিমাণ নারকেলের দুধ মিশিয়ে দেবে এবং এক কাপ জল দেবো এবার দশ মিনিট পর যখন মাংস সেদ্ধ হয়ে আসবে তখন উপর থেকে ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে কিছুক্ষন ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন, দুর্গা পূজা স্পেশাল রেসিপি সফেদ মুর্গ .. আশা করি আপনাদের সকলের এই পুজো স্পেশাল রেসিপি খুবই ভালো লেগেছে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং সুস্থ থাকবেন খুব ভালো থাকবেন...

"সফেদ মুর্গ্"

"বাবর - ই - হান্ডি"

"কুমড়ো চিংড়ি"

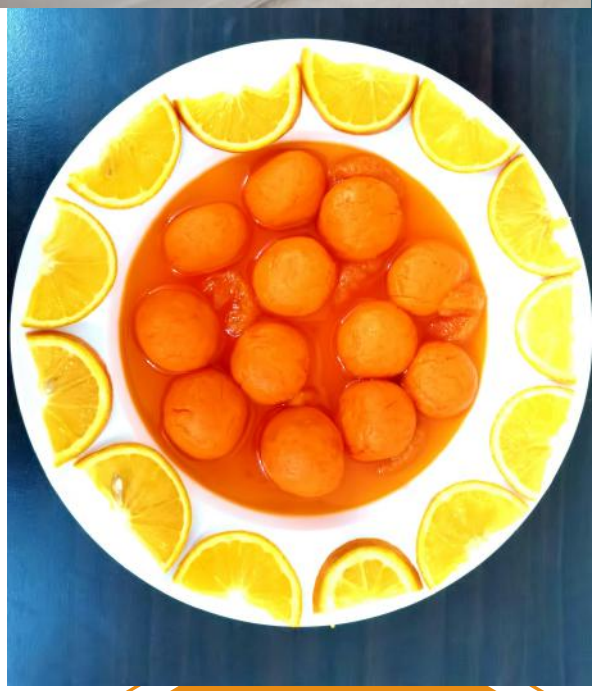

"কমলা ভোগ"

Raajbarir khawa

on B/171 Survey Park, Santoshpur, just 5 minutes from Ajoynagar crossing off EM Bypass.Walk into the comfortable but gorgeous ambience of Rajbari & you will actually feel that you have gone back in time to the past days of the Kings when attendants constantly pampered you with delicacies in ornate dining halls.

বং সৃজনী ফ্যাশন বিভাগ

--সায়নী দে, বেলজিয়াম

**শারদীয়ার ফ্যাশন মানে শুধু চার দিন তো নয়, এ প্রস্তুতিও শুরু হয় বহু মাস আগে থেকে-
সঠিক খাদ্যাভ্যাস , ঘর গৃহস্থালী সাজানো, পছন্দের কুশন কভার , বেডশীট থেকে শুরু করে রূপচর্চা সবেতেই আসে সাজ সাজ রব ।
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাঙালিও এখন পুজোর ফ্যাশনে এগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। তাই
সঠিক মেকআপ থেকে শুরু করে ব্যালকনির কোনা ও সেজে ওঠে পুজোর ফ্যাশনে।
এবার আসা যাক কাজের কথায়,**

 # সপ্তমী হোক একটু হালকা। ওয়েস্টার্ন লুক দিয়ে শুরু হোক পুজো । লেপার্ড প্রিন্টের টপ আর ব্লু ডেনিমে সবার নজর আটকাতে বাধ্য অথবা হালকা তাঁতের শাড়ি আর স্নিগ্ধ সাজে মাতুক সপ্তমী।

 # অষ্টমীতে থাকুক চিরাচরিত সাদা লাল এর ছোঁয়া দেওয়া কাঞ্জিভরম সাথে নাকে বড় সাইজের নথ এবং আঙুলে থাকুক বড় মুক্তোর আংটি ব্যাস অষ্টমীর সাজ জমজমাট ।

 # দশমীতে মায়ের বিদায়বেলায় সাজ হোক আরও স্নিগ্ধ , সাদা ঢাকাই জামদানি আর তার সাথে লাল ব্লাউজ।

 # নবমীর সাজেও থাকুক সাবেকিয়ানা । বেগুনি রঙের বেনারসির ঝলকে আপনি হয়ে উঠুন সবার মাঝে অনন্যা কিংবা ওয়েস্টার্ন সর্ট স্কার্ট আর স্মোকি আই মেকআপে নবমী ও জমে ক্ষীর।

এই ছিল সৃজনী তরফ থেকে পুজোর ফ্যাশন এর টুকিটাকি।

সমকালীন নৃত্যশৈলী এবং ভারতে তার প্রত্যাবর্তন

--তনুশ্রী শঙ্কর, ভারত

সমকালীন নৃত্যশিল্পীরা অসাধারণ নৃত্য ভঙ্গিমায় মন ও শরীরের এক মাধ্যম তৈরী করার চেষ্টা করে । এই নৃত্যশৈলী নিজস্ব কোরিওগ্রাফিতেও ভীষন ব্যাখ্যামূলক এবং প্রায়শই আবেগ এবং গল্পের সংযোগ করে।

উদয় শঙ্কর ভারতে সমসাময়িক নৃত্যের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি অভিনব একটি ভারতীয় নৃত্য শৈলী তৈরীর জন্য পরিচিত যা তিনি ১৯২০ দশকের প্রথম দিকে খ্যাতিমান ব্যালেরিনা এনা পাভলোভার সহযোগিতায় অভিনয়ও করেছিলেন । ১৯৩০ এর দশকে তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিম ভারতেও তার অভিনব শৈলীর জন্য বিখ্যাত এবং এরকম প্রথম ভারতীয় হয়ে ওঠেন ।

উদয় শঙ্কর নৃত্য শৈলী সর্বত্র আবেদনসহ উৎস এবং চেতনায় অত্যাধুনিক এবং উপস্থাপনায়ও আধুনিক , এটি মূলত উদ্ভাবনী এবং তাই জন্যই ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী এবং ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ।

উদয় শঙ্কর এর পুত্র আনন্দশঙ্কর ছিলেন অগ্রণী বিশ্বসঙ্গীত স্রষ্টা এবং পুত্রবধূ তনুশ্রী শঙ্কর উদয় শঙ্কর নৃত্যশৈলীর প্রচলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং উদশঙ্কর এর সঙ্গীত এবং অন্যান্য সুরকার-সঙ্গীত পরিবেশনায় তার একটি নৃত্য ট্রুপও তৈরি করেছিলেন । আনন্দ শঙ্কর এর মৃত্যুর পর তনুশ্রী শঙ্কর এই উত্তরাধিকারের প্রধান আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন, তিনি তনুশ্রী শঙ্কর নৃত্য সংস্থা (টিএসভিসি) এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ গোটা ভারত এবং অন্যান্য ৪০ টি দেশ জুড়ে পরিবেশনার মাধ্যমে এখনো সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ।তনুশ্রী শঙ্করকে ২০১১ সালে ক্রিয়েটিভ এবং পরীক্ষামূলক নৃত্যের অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার সম্মানে ভূষিত করা হয় । তিনি উদয়শঙ্কর নৃত্যশৈলী সংরক্ষণ এবং তা প্রচারের জন্য তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তার জন্য তার কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর যিনি নিজেও একাধারে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী তিনি ও সহায়তা করেছেন ।

তনুশ্রী শঙ্কর এই অনন্য নৃত্যশৈলী কে জনপ্রিয় করেছেন যা সর্বত্র অত্যন্ত সম্মানিত । এই নৃত্য শৈলীর জনপ্রিয় কিছু সৃষ্টি গুলো হল “uddharan” (কারো আত্মার উত্থান) , “chirantan” (চিরন্তন),“the child” (কবিগুরুর একমাত্র ইংরেজী কবিতা থেকে প্রভাবিত) , “ we the living “(সুফি কবি অবলম্বনে জেলালুদ্দিন রুমির কবিতা মনুষ্য ওমানুষ শিরোনাম) বিপুলভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে ও নিদর্শন তৈরি করেছে ভারত ও বিদেশেও। প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় লীলা ভানসালি তার প্রথম ফরাসি অপেরা “পদ্মাবতীর” জন্য সেরা কোরিওগ্রাফার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তনুশ্রী শংকর কে যা প্যারিসে প্রিমিয়ার হয়েছিল, তনুশ্রী শংকর ট্রুপ এর সদস্যরাও অংশ নিয়েছিল এই প্রযোজনায়।

তনুশ্রী শংকর এই অভিনব নৃত্যশৈলী গোটা বিশ্বের সকলের জন্য ২০২০ সালের জুলাই থেকে অনলাইন কর্মশালা মাধ্যমেও অব্যাহত রেখেছেন। স্বল্প সৌভাগ্যবান অংশগ্রহণকারীরা তার সাথে কথোপকথনের সুযোগ পেয়েছে এবং এতে জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বাড়ছে প্রতিদিন এবং গোটা বিশ্বের থেকে সকলেই অনুরোধ করছে এই সুযোগের জন্য। তার সাবলীল নৃত্য ভঙ্গিমা এবং অভিনব নৃত্যশৈলী এক জাদু মন্ত্রের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । তার কর্মশালা শিক্ষার্থীদের অনুরোধে আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি।

তনুশ্রী শংকর উদয় শংকর নৃত্যশৈলীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন শুধু তাই নয় তিনি শেখানোর দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করেছেন এবং সেই দক্ষতার ছাত্রছাত্রীদেরমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে কর্মশালা অব্যাহত রয়েছে এবং অংশগ্রহণে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন প্রদত্ত এই নম্বরে @ 9830051115 অন্যথায় ইমেইল মাধ্যমেও যোগাযোগ সম্ভব shankartanusree@gmail.com

প্রগতি বাংলা

অরিজিৎ কুমার নিয়োগী, ভারত

অধ্যাপক অরিজিৎ কুমার নিয়োগী একজন কর্পোরেট লিডার , উদ্যোক্তা , এবং ব্র্যান্ড প্রগতি বাংলার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ও একইসাথে কিউরেটর। জাতিগত পোশাক ব্র্যান্ডের মালিক ডঃ অরিজিৎ কুমার নিয়োগী ক্রিয়েশনস ELEGANCE , ট্যাগ লাইন Aristocracy & sophistication well Defined well সংজ্ঞায়িত তিনি স্টাডি বোর্ডের সদস্য MAKAUT, পূর্বে WB university of technology Govt of WB এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মেডিকেল -এলায়েড হিথ কোর্স এবং ভারত সরকারের NSODC রাজ্যের দায়িত্বে থাকা অনুষদ । তিনি চার্টার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং চেয়ারম্যান কার্যক্রম, কলকাতা গ্যালাক্সির RC ক্লাব, Rotary international । তিনি Lions ক্লাব অফ কালচারাল হেরিটেজ সিটি Lions ইন্টারন্যাশনালের চার্টার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সচিব। তিনি জনস্বার্থে স্বাস্থ্য ও চোখের যত্ন প্রচারের মতো স্বাস্থ্য ও অপটি কেয়ারের মতো অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ।তিনি একজন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজক, প্রগতি বাঙলা প্রযোজনার পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা এবং AKN মডেলিং ও ডিজাইনার স্টুডিওর মালিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ২৯ টি জাতীয়, ১৯ টি আন্তর্জাতিক এবং ৩৯ টি রাজ্য স্তরের পুরস্কার পেয়েছেন। ICF গ্লোবাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২০ সিক্স সিগমা অস্কার অফ হেলথ কেয়ার ২০২০ তার নাম ব্র্যাভো ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এশিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে আইকনিক ইভেন্ট অর্গানাইজার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস থেকে ইন্ডিয়ান হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড ২০২১ পেয়েছেন সমাজকল্যাণের গহনা, গর্ব বেঙ্গল ২০২০ ইত্যাদি। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, WB ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স থেকে মেডিকেল গ্রাজুয়েশন, অ্যাপোলো গ্লিনিগলস হাসপাতাল থেকে এমবিএ। LV প্রসাদ চক্ষু ইনস্টিটিউট হায়দ্রাবাদ ডঃ নিওগী সমাজসেবায় সম্মানজনক ডক্টরেট পেয়েছেন এবং ইতালি থেকে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদানের জন্য। উদ্যোক্তা হওয়ার পথে, তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন তার নিজের দাতব্য এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা সচিব হিসেবে, তার দক্ষতার ক্ষেত্রটিতে রয়েছে মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্ক, আর্ট প্রেমী, জাতিগত ডিজাইনার, প্রযোজক, শর্ট ফিল্মের পরিচালক। FCTWEI ১৭ বছরের জন্য প্রগতি বাংলা উৎসবের নামে মেগা ফেস্টের বিশ্ব আয়োজক ।

তাকে ভারতীয় নৃগোষ্ঠীর প্রবর্তক উইটার বেঙ্গলিয়ানা আইকন অনুমোদন করা হয়েছে। প্রগতি বাংলা টিভির প্রধান সম্পাদক এবং তার ব্র্যান্ড প্রগতি বাংলা থেকে একটি জাতীয় ম্যাগাজিন বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিত বিভিন্ন জাতিগত বিষয় প্রচারের জন্য।
ডঃ নিয়োগী বৈদিক সংস্কৃতি এবং প্রাচ্য অধ্যয়নের মতো জ্যোতিষশাস্ত্রীয় এবং জাতিগত পোশাক এবং সংস্কৃতিতে তার ব্র্যান্ড প্রগতি বাংলা ইতিমধ্যেই ভারতের সীমানা অতিক্রম করেছে এবং এখন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় । পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেলিব্রেটিদের সাথে তার জাতিগত পোশাক ব্র্যান্ড ELEGANCE প্রবর্তন আমাদের দেশের বাইরেও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি জাতিসত্তাকে প্রচার ও জনপ্রিয় করে তুলেছে , এবং তার বানানো এ্যক্রিলিক ফ্যাব্রিক , হ্যান্ড পেইন্টিং ব্যবহার করে প্রাণবন্ত পেইন্টিংগুলির জন্য বিদেশেও বহুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

খেলার জগৎ

সুব্রত ভট্টাচার্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা

--কুমার সিদ্ধার্থ, ভারত

এই মুহূর্তে আমি ভারতীয় ফুটবলের স্তম্ভ সুব্রত ভট্টাচার্য বা বাবলুদার সামনে বসে আছি। দীর্ঘদিন ধরে বাবলুদা ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। একজন নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার হিসেবে তিনি বহু আক্রমণ রুখে দিয়েছেন। এরই পাশাপাশি তাকে পরবর্তীকালে আমরা একজন সফল কোচ হিসেবে দেখেছি। কোচ হিসেবেও তিনি বেশ কয়েকটি অসাধারণ রেকর্ড করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সুব্রত ভট্টাচার্য দীর্ঘ ১৭ বছর ১৯৭৪ - ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মোহনবাগানের দুর্গ সামলেছেন। ১৯৭৭ সালে তিনি শতাব্দী প্রাচীন এই দলে অধিনায়কত্ব করেন। সেই বছর মোহনবাগান ভারতের প্রথম দল হিসেবে ট্রিপল ক্রাউন লাভ করেছিল। এছাড়া সুব্রত ভট্টাচার্যের জীবনে আর এক অবিস্মরনীয় ঘটনা হল তারকাসমৃদ্ধ কসমস দলের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ম্যাচ অমীমাংসিত রাখা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে কসমস দলে বিশ্ব বিখ্যাত পেলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কিংবদন্তি খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্যের সামনে আমার কিছু প্রশ্ন :-

মোহন বাগান ক্লাব

 # আচ্ছা সুব্রতদা, আপনি কয়েক প্রজন্মের খেলোয়াড় কে চোখের সামনে দেখেছেন একজন কোচ হিসাবে আপনার কি মূল্যায়ন?

--সত্যি কথা বলতে কি এখনকার ফুটবল আগের থেকে অনেক বেশি গতিময় হয়ে উঠেছে। এর কারণ এখন টেলিভিশন এবং মোবাইল ফোনের কল্যাণে আমরা পৃথিবীর যেকোনো দেশের খেলা এক মুহূর্তে দেখতে পারি। এছাড়া ভারতে পেশাদারী লিগ শুরু হয়েছে। তরুণ ফুটবলাররা বিশ্ব বিখ্যাত বিদেশি খেলোয়াড়দের পাশাপাশি খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। যেটা আমাদের সময় ছিল অকল্পনীয়। এর ফলে তারা অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক ফুটবল জগতের সাথে যুক্ত হতে পারছে।

 # কিন্তু এর ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবল মানচিত্রে ভারত কি এগোতে পারছে? যদি না পারে তাহলে কোন বিষয়কে আপনি দায়ী করবেন?

-- এই প্রশ্নটা শুনে বাবলুদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন -- সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ফুটবল খেলা এত গতি সম্পন্ন এবং আধুনিক হয়ে উঠেছে যে আমাদের পক্ষে তাল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। হয়তো কোন কোন সময়ে ভারতীয় ফুটবলাররা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। অনেক ভারতীয় ফুটবলার ইউরোপিয়ান লিগে ডাক পেয়েছে। যেমন সুনীল ছেত্রী কিংবা সন্দেশ। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় ফুটবলাররা সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। এর জন্য কোন একটি বিশেষ দিককে চিহ্নিত করা উচিত নয়। আরো বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা উচিত, তবেই আমরা আধুনিক ফুটবলের কৌশল সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারব।

 # আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল আচ্ছা বাবলুদা আপনি ডিফেন্ডার এবং কোচ এই উভয় ভূমিকাতেই যথেষ্ট সফল। কিন্তু একজন খেলোয়াড় নাকি একজন কোচ হিসেবে আপনি বেশি তৃপ্ত?

-- এই প্রশ্ন শুনে বাবলুদা একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন -- আমি খেলার জগতে এসেছি একজন ডিফেন্ডার হিসেবে। পরবর্তীকালে যদিও আমি একজন সফল কোচ হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু আমার রক্তে আছে ফুটবল। তাই আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আমি কোন ভূমিকাতে বেশি তৃপ্ত তাহলে বলবো যখন উল্কা গতিতে ছুটে আসা একজন খেলোয়াড়ের পা থেকে বল বাঁচিয়েছিলাম তখনই সবথেকে বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম। তবে একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যখন ছোট ছোট ছেলেরা আমার প্রশিক্ষণে ভালো খেলে বড় দলকে রুখে দেয় তখন মনে একটা দারুন তৃপ্তি আসে।

 # অনেকেই বলে থাকেন আপনি মোহনবাগানের ঘরের ছেলে। একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে লক্ষ লক্ষ মোহনবাগান ফ্যানের কাছে আপনি কিংবদন্তির মহানায়ক। ভবিষ্যতে কোন কারণে আপনি মোহনবাগান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এর অন্তরালে কি কারণ ছিল তা জানাবেন কি?

-- অতীতে যে ঘটনা ঘটে গেছে আমি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমি মনে করি একজন খেলোয়াড় হিসেবে সব দলের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। তবে মনে প্রাণে আমি মোহনবাগানকে ভালোবেসেছিলাম একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখানেই শেষ হয়ে গেল আমাদের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা। আমি বেশ বুঝতে পারলাম একসময় যেমন ডিফেন্ডার হিসেবে সুব্রত চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতেন, সাংবাদিকের সামনে সেভাবেই তিনি মেলে দিয়েছেন। তবু তার কাছ থেকে কিছু অচেনা অজানা তথ্য পাওয়া গেল সেটাই বা কম কি?

হাওয়ার নুপূর

-চারুচন্দ্র রায়, ভারত

পৌষ দাঁতে কুটিকুটি হাওয়ার নুপূর
শরমরাতের মরম কথার এক ব্যথাতুর
কাটছে শিরা বুকের ভিতর বৈরাগী ক্ষুর বৈরাগজী ফুর
এই আমিটা কাতর স্বরে
অন্য জ্বরে, বেভুল ঘরে
হাতের মুঠোয় না চায় বসে অমল দুপুর অমল দুপুর
রগচটা বসে ঝগড়া করে দুই পাঁজড়ে
দুচোখ তাদের ভাতের থালায় ফুলের মালায়
ভাবের ভাপে হৃদপিণ্ড গোলাপ পোড়ে গোলাপ পোড়ে
জলের ভিতর তৃষ্ণা বসে কাঁদতে থাকে এক নাগাড়ে
এই বাদাড়ে,
চোখের কাছে মলিন দুপুর
মন ব্যথাতুর,
বুকের ভিতর বৈরাগী ক্ষুর
বাজতে থাকে হাওয়ার নুপূর হাওয়ার নুপূর।

বসে আছি

--সুমি দে, ভারত

তুমি এক গুচ্ছ গোলাপ দিয়ে বলেছিলে
আজ আমি যাই, আবার আসব।
ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখে, তোমার প্রতীক্ষায়
একটা গোলাপ গাছ লাগিয়েছি।
রোজ তাতে জল দিই, আমার প্রদীপ জ্বালাই
প্রতিদিন, যদি ফিরে আসো।
চাঁদকে বলেছি, তোমার পথে আলো দিতে
বৃষ্টি - তুমি বাধা দিও না। আর বাতাস,
সব শুক্ল পাতা নিয়ে এসো আমার আঙিনায়
যেন পাতার মর্মরধ্বনিতে - বুঝতে পারি - তোমার আগমন।
গাছে মর্মরধ্বনি, ঝোড়ো হাওয়ায় -
আমার প্রদীপ থরথর, পুঞ্জ মেঘে ঢাকা,
চাঁদের আলো তুমি তো এলে না
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল, ভোরের শিশিরে
টোকা লেগে একটা একটা গোলাপ পাপড়ি খসে পড়ে।
তুমি কি আসবে?

বন্যা

--পৃথা মন্ডল,ভারত

ইঁটে কাঠে পাথরের কংক্রিটে
গড়ে তুলেছ বাঁধ,
বদলে দিয়েছ নদীর গতিপথ।
যতবার উঠেছে জলোচ্ছ্বাস
ততবার শক্ত করেছ মুঠি
দাঁতে দাঁত চেপে করেছ লড়াই
জিতে গেছ প্রতিবার।

এবার বর্ষায়, পূবের পাহাড়ে
সে কি ভীষণ বৃষ্টি
চারিদিকে জারি হয়েছে সতর্কতা
'সে আসছে.....'
আবার শক্ত করো চোয়াল
আবার প্রলেপ দাও কংক্রিটে
আবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে গড়ে তোল প্রতিরোধ
দেখি তোমার শক্তি!
এবার যে নদীতে বাণ ডেকেছে।

ধূসর প্রেম

--আল্পনা দাস, ভারত

হিম শীতল শহর কলকাতা,
আবেগী কুয়াশায় ডুব দিয়েছে হাওড়া ব্রীজ।
মাঝ গঙ্গায় ছোট নৌকায় চুপি চুপি
যৌন প্রেমে মগ্ন মৎস্য কন্যার সাথে রুপালি যুবক।
মিলেনিয়াম পার্ক এর হলুদ গোলাপের সুগন্ধি আবেশে
ডুব দিয়েছে পৌষালী সময়,
শহর সেজেছে বর্ষবরণের নতুন সাজে।
রুপালি চাঁদ চুঁয়ে চুঁয়ে নামছে গঙ্গা বুকে।
শরীর শীতল থেকে প্রেমের উষ্ণতায় উষ্ণ হচ্ছে,
মৎস্যকন্যার প্রেমের কোন স্বপ্ন নেই,
সে যেন শুধু শরীর খুঁজে পায় রাত্রির অন্ধকারে।
অন্ধকারে চাঁদের আলো ফিকে হয়ে যায়।
যুবকের যৌন খিদে মিটে গেলে মৎস্যকন্যার পেটের খিদে মেটে।
হিম শীতল শহর কলকাতায় আবেগি কুয়াশায়
ডুব দিচ্ছে জীবন।

হৃদয়

--উদয় সাহা, ভারত

লুকোনো ডাকবাক্সের কাছে যাওয়া হ'ল না আর
টেকেন ফর গ্রান্টেড অক্ষরগুলো
আজ বকুল ফুলের কাঙাল...

আমাদের ঘরে ঘরে তাঁতকল
আমাদের আকাশে প্লাস্টিক চাঁদ

কোমল দুঃখগুলোকে নিয়মিত খুন করে
সাজিয়েছি হত্যার হরিৎক্ষেত্র এক...

তোমাতে আমাতে চোখে চোখে ফুল
ঠোঁটে ঠোঁটে কালো অন্ধকার --

আমি এ আঁধার ছুঁয়ে বলেছি, হৃদয়

ভদ্রলোক

- বিশ্বজিৎ দে, ভারত

সেদিন শিশুটির মনে জেগে ছিল এক
অতি গম্ভীর প্রশ্ন!
জিজ্ঞাসিল মোরে পারিপাট্য পোষাকে
ভদ্রলোক সাজা যায়,
ভদ্র হওয়া যায় কখনো?

উত্তর কোনও দিতে নারি তারে।
আমার যে পরিধানে ছিল
পোষাক ভদ্রলোকের মত, কি কহিব উহারে?

বিচারের ভার দিলাম তারে।
কহিলাম, অভিজ্ঞতায় বুঝিবে
ভদ্রলোক বলে কারে,
পারিপাট্য পোষাকে না ব্যবহারে।

হৃদয়ের রং

রং

--ডঃ কেতকী দত্ত, ভারত

মাস্ক, স্যানিটাইজারে জীবনের সব রং যেন আটকে গেছে গত একবছর ধরে। মা কে বারবার জিজ্ঞেস করাতে নীপুর মা নীপুকে বলেছেন, "এ বছর রং খেলতে হবেনা।" কাকেই বা রং দেবে সে, কে খেলবে রং তার সাথে! ছোট্ট নীপুর তাই মন খারাপ। দোলের দিন মা'র হাত ধরে সে গেছে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে। ঠাকুরের পায়ে রং দেবার পর যে বালকৃষ্ণ মূর্তিটি বাইরে মালা পড়ানো ছিল, তাকেই ইচ্ছেমতো রঙে রাঙিয়ে তুলেছে নীপু। মা অদূরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন আর অবাক হয়ে শুনেছেন কেমন করে পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি কথা বলেছে বালগোপালের সাথে। পাথরের মূর্তি হয়তো কোন জবাব দেয়নি, তবে তার রঙের আতিশয্যে অম্লান হাসিটি অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। ভালোবাসার প্রতিফলন যে ভালোবাসাই , রঙের বিকিরন যে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, তা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি ছোট্ট নীপুর। সে যেন বালগোপালের মুখে হাসি দেখতে পেয়েছে, বুঝেছে তার ভালোলাগা টুকুও! নীপুর মায়ের হাতেও ছিল রং। বাকি সবাই যারা ওখানে গিয়েছিলেন তাঁরা রাধাগোবিন্দের সাথেই খেলেছেন দোল। মানুষে মানুষে দূরত্ব বজায় রেখে, মুখবন্ধনীতে মুখটি ঢেকে একধরনের যান্ত্রিকতা ছিল এতে। কিন্তু অকৃত্রিম প্রেমের কোন খামতি ছিল না বোধহয়। সারা রাস্তা নীপু মা কে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে, তার মধ্যে যে প্রশ্নে এসে বাকরুদ্ধ হয়েছেন মা তা হচ্ছে, "আচ্ছা মা, সত্যিই কি পাথরের গোপালের প্রান আছে? রং মাখাবার পর চোখদুটোতে কেন হাসি দেখলাম! চোখে মুখে সে হাসি যেন ছড়িয়ে গেল!" মা নিরুত্তর। এ তো গভীর দর্শন ও উপলব্ধি!

রাজা আর ভাইরাস

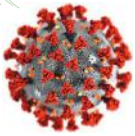

--অমরনাথ বাসুদেব সেনগুপ্ত,ভারত

আমি আর তুই একদিন, একদিন চলে যাবো।
এই মৃত্যু, এই পিঞ্জর, ভাঙা শহর ছাড়িয়ে যাবো।
লক্ষ চিতায় শ্মশান এখন কারবালা
পিত্ত রসে স্বচ্ছ তোয়া পিঙ্গলা,
হাজার লাশের দাফন হলো এই মাঠে
রুধির স্রোতে পঙ্কিলাকার পথ চলা।
কোথায় যাবি, কোন স্টেশনের গা ঘেঁষে?
মৃত্যু শোকের মাতম চলে সেই দেশে।
হায় রে তোদের শষ্যভূমি উর্বরা
পচন গন্ধ মাঠের হাওয়ায় যায় ভেসে।
অণু জীবের চোখ রাঙানি সাক্ষী তার
রাষ্ট্র নখর, শোনিত রঙা হিংস্রতার
শিয়াল-শকুন মত্ত যখন লাশ ভাগে;
সৌধ-সুখে আত্মরতি দেশনেতার।
শিরায় শিরায় শোনিত কণা টগবগে
অগ্নিপুরে রুদ্র বীণার সুর জাগে
জেহাদ জাগে এই শাহিদের মর্মে আজ,
গলায় আমার ইন্তেকামের স্বর লাগে।
কোথায় যাবি? থাকবো বরং এইখানেই।
কাটবো মাটি ভাঙা নদীর পাড় ধরেই
রাজার মাথা এক কোপেতেই কাত করে,
গাজী হব পৌত্তলিকের প্রেম ভেঙেই।

পত্রমিতা

--অনুপম ব্যানার্জী, বেলজিয়াম

অনেক কাল আগে দূরদেশে পাহাড় ঘেরা এক গ্রাম ছিল, ঠিক যেন পাহাড়গুলো পরম মমতায় তাদের কোল বিছিয়ে এই গ্রামটিকে আশ্রয় দিয়েছে। আর গ্রামের ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে টলটলে জল এক দীঘি। গ্রামে কয়েক ঘর কৃষকের বাস, আর দীঘির স্ফটিক জলে কয়েক জোড়া মাছের। পাহাড়ের চড়াই ছেড়ে, ঘন জঙ্গল ছেড়ে যে জমিটুকু রয়েছে গ্রামের ইতিউতি ছড়িয়ে তাতে মিলে মিশে চাষ আবাদ করে গ্রামের মানুষের সুখে-শান্তিতে দিন কেটে যায়। গ্রামের কোণে-কোণে, পাহাড়ের ঢালে-ঢালে, জঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ায়, জলের দোলায়-দোলায় ছড়িয়ে সুখ-শান্তি-আনন্দ-আহ্লাদ। অমন ছবির মত সুন্দর গ্রাম, অমন পড়শীতে পড়শীতে ভালবাসা মানুষ আর কখনও দেখে নি। সেই আনন্দ, সেই ভালবাসা দীঘির জলে মিশে তার রুপোর বরণ মাছগুলিকেও যেন করে তুলেছে প্রাণচঞ্চল, স্ফুর্তিতে ভরপুর। সারাটি দিন গ্রামের মানুষ ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে লাঙল চালিয়ে বেড়ায়, বনে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে। আর তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে মাছগুলোও দীঘির জলে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে বেড়ায়, আর তারপরে বেজায় শ্রান্ত হয়ে জিভে জল আনা কেঁচো আর শ্যাওলা খেয়ে চোখ খুলে ঘুমিয়ে পড়ে।

গ্রামের এই দীঘিটি সকলের খুব প্রিয়। গাঁয়ের সব পরবই হয় এই দীঘির পাড়ে। দীঘির পাড়ে বটগাছটিতে সুতলি জড়িয়ে জড়িয়ে আর সিঁদুর লেপে লেপে তাদের ভূমিদেবতার পুজো আর জলদেবতার পুজো - সে এক দেখার মত ব্যাপার। দীঘি ছাড়া আর গ্রামের সকলের নয়নের মণি বলতে তিরকু। সে এক ঝাঁকড়া চুলো, টানা টানা চোখ, দেবশিশু নন্দলালার মত দেখতে ছেলে বটে। দেখে তোমাদের মনে হবে, কুমোরটুলির পালেরা যেন তাদের শিল্পীর হাত দিয়ে এ ছেলেকে মূর্তি করে গড়ে দিয়েছে। আর তেমনি লক্ষ্মী এর স্বভাব। সাধে কি গ্রামের সকলের চোখের তারা, কলজের টুকরো, পরানের স্পন্দন তিরকু? ও, তিরকুর বন্ধুর কথা তো তোমাদের বলাই হয় নি। গ্রামের যে দীঘির কথা একটু আগে তোমাদের বললাম, তার কাকচক্ষু জলে বাস তিরকুর বন্ধুর। হ্যাঁ, সে আবার দীঘির সব মাছেদের নয়নমণি ছোট্ট একরত্তি মাছের পোনা। তিরকু আর সে যেন দুই শরীর, এক হৃদয়। তিরকু দীঘির কাছটিতে এলেই কেমন করে সে যেন ঠিক টের পায়। তিরকুর প্রাণের টান সেই দীঘির জলটিতে ছড়িয়ে কম্পন সৃষ্টি করে আর তার মাছ বন্ধু নিজের পার্শ্বরেখায় সেই কাঁপন অনুভব করে ছুট্টে দীঘির পাড়টিতে গিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেয় যেখানটিতে তার তিরকু বন্ধু তার সঙ্গে গল্প করবে আর খেলা করবে বলে অপেক্ষা করছে। তারপরে তাদের সে কি গল্প, সে কি খেলা, সে কি হাসি! রোজ সকালটিতে তিরকুর দীঘির পাড়টিতে যাওয়া চাই-ই চাই। কোনদিন ঘুম ভাঙতে দেরী হলে তার মা তাকে ঘুম ভাঙিয়ে খাবার খাইয়ে মাছবন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। অবশ্য এমন খুব কমই হয় যখন তিরকুকে সকালে ঠেলে তুলতে হয়। কারণ সুয্যিমামা উঠলেই বনের যত পাখি, গ্রামের যত পাখি সবাই মিলে ডেকে তিরকুকে আর বিছানায় থাকতে দেয় না। তারপর নাওয়া-খাওয়া করে সেই যে তিরকু দীঘির পাড়ে গেল, আর দুপুরে মা ডাকলে একবারটি খেতে আসার জন্য সে বন্ধুর কাছছাড়া হয়। তারপর সুয্যিমামা পাটে যেতে বসলে তিরকু সেই মাছের পোনাটিকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ি ফেরে। গ্রামের সক্কলে তা জানে। এইভাবে দিন কাটছিল। এমন সময় গ্রামে এলেন দুর্দান্ত এক ঋষি। গ্রামের মানুষ তাঁকে মাথায় করে এনে গ্রামের বটতলায় বসালে, পরম যত্নে তাঁর পর্ণকুটির বানিয়ে দিলে। এমন প্রবলপ্রতাপ ঋষির তাদের গ্রামে আগমন যে তাদের জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য!

ঋষি গ্রামে এসে শুরু করলে তপস্যা। সে তপস্যার বলে আকাশ কালো হয়ে এল, মাটি কাঁপতে লাগল, দীঘির জলে ঢেউ উঠল। গ্রামের মানুষ ভয় পেয়ে গেলে, মনে মনে ঠাকুর স্মরণ করলে কাঁপতে কাঁপতে। কিন্তু ঋষির তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটানোর সাহস কারও হল না। সে কি সাধারণ সাধনা! তবে কিছুদিনে আকাশ হল পরিষ্কার, মাটি হল স্থির, দীঘির জল হল শান্ত। কিন্তু কিছু একটা ঠাহর হল যেন বদলে গেছে চিরদিনের তরে। সে হল গাঁয়ের আবহাওয়া। আর বছরগুলিতে কই গ্রামে এত শীত অনুভব হয়নি তো কখনও! এবার যেন একটু বেশীই। ঋষির তপস্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল শীত। যেমন এগোল তপস্যা তেমনি বলশালী আকার ধারণ করল ঋষির শরীর। তেজের প্রভাবে যেন আগুন বেরোচ্ছে। চারপাশের সমস্ত কিছু থেকে তেজ শুষে নিয়ে সাধনার বলে ঋষি হয়ে উঠলে অপরিসীম শক্তির আধার। আর চারপাশের প্রকৃতি তার সবুজ হারিয়ে, তার শক্তি হারিয়ে, তার দীপ্তি হারিয়ে হয়ে উঠতে লাগল ম্লান, শীতল।

এবছর গ্রামে প্রথম বরফ পড়ল। আগে কোনদিন কেউ কখনও যা দেখে নি। প্রথমে কিছু আনন্দ হলেও সকলের বুঝতে দেরী হল না যে, প্রকৃতি তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত রক্ত হারিয়ে ক্রমশঃ সাদা হয়ে উঠছে, কঠিন শীতল হয়ে উঠছে। পৃথিবীর সমাপ্তি যেন আসন্ন। গ্রামে ক্রমে ক্রমে বাড়ছে অসুখ, মহামারী। দীঘির জল জমে গিয়েছে। মাছগুলি নিষ্পলক চোখে মৃত্যুর দিন গুনছে। গ্রামবাসী শরীরগুলো টানতে টানতে ঋষির পায়ে এসে পড়লে। ভগবন্, তোমার এ ভয়ানক সাধনা প্রত্যাহার কর। আমাদের রক্ষা কর। ঋষির চোখ কাঁপলে না, ঠোঁট কাঁপলে না, প্রাণ কাঁপলে না। সমস্ত গ্রাম যেন আসন্ন মৃত্যুর প্রহর গুনছে। পরাক্রমী ঋষি এতবড় সর্বনাশের তোয়াক্কা করলে না। ক্ষমতার লোভে স্বার্থান্ধ হয়ে প্রকৃতির এতবড় ক্ষতি দেখতে পেলে না। তাঁকে থামায় এমন সাধ্যিও মনে হয় কারও নেই। গ্রামের মানুষ নিয়তিকে অসহায়ভাবে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হল। তিরকু দীঘির এক পাশটিতে বসে আছে প্রায় জমে যাওয়া জলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে। ঐখানটিতে একটু জমতে বাকি থাকা জলের মধ্যে দিয়ে তার দিকেও নিষ্পলক তাকিয়ে তার প্রাণের বন্ধু মাছ। এই চাওয়াচাওয়ি হয়ত আর কিছুক্ষণের, কয়েক মুহূর্তের। যতক্ষণ এই বাকি জলটুকু জমতে লাগে। তারা সারা জীবন একসাথে থাকবে ঠিক করেছিল, আর কোথা থেকে কী হয়ে গেল! সারা জীবনের তুলনায় এই আসন্ন কয়েক মুহূর্ত কত সামান্য, কত অপ্রতুল! জমে থাকা কত কথা সময়ের অভাবে, তাড়নায় মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ঠেলাঠেলি করছে, বেরিয়ে আসতে পারছে না। সময় বুঝি শেষ। পাহাড় প্রমাণ জমাট দুঃখ তিরকুর বুক ঠেলে, গলা ঠেলে, চোখ ঠেলে এক ফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল দীঘির জলে। আর তখনই ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড, এক অপার্থিব ঘটনা, এক অলৌকিক চমৎকার। দুঃখের দহনে বেরোনো তিরকুর একফোঁটা চোখের জলের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল দীঘির জলে, আসতে আসতে গলতে লাগল বরফ। বন্ধুত্বের সেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল পরিবেশে, আকাশে, বাতাসে।
পরদিন সকালে সকলে দেখল এক অদ্ভুত কাণ্ড। দীঘির পাড়ের সেই বটতলা সাদা হয়ে রয়েছে। বরফে নয়, ফুলে। আর তার পাশে নিশ্চল শায়িত রয়েছে ফুলে ফুলে ঢাকা ঋষির দেহ। তার মাথার কাছটিতে সাদা কাগজে লেখা একখানি চিঠি। তেমন কাগজ, তেমন কালি, তেমন হাতের লেখা কেউ কখনও দেখে নি। তাতে মুক্তোর অক্ষরে লেখা —¨পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ শক্তির কোন মূল্য নেই। সকলের বন্ধু আছে, থাকা দরকার। অমন ছোট্ট তিরকুরও মাছবন্ধু আছে। তোমার কোন বন্ধু নেই। তুমি আমার কাছে চলে এস।।¨ — চিরসখা

ছেঁড়া মানি ব্যাগ

--সুভাষ_সরকার, ভারত

বেশ ক-বছর আগের ঘটনা, -ভোর রাতে শ্যাওড়াফুলী যাচ্ছি সব্জি আনতে। আমার বাড়ি থেকে মণিরামপুর দুইপয়সা খেয়াঘাট পার হয়ে যাব শ্যাওড়াফুলী সব্জির আড়োতে! সেখান থেকে সব্জি কিনে এনে পলতা বাজারে সব্জির দোকানদারদের পাইকারি দরে সব্জি বিক্রি করি,- কখনো কখনো প্রয়োজন মতো নিজেও খুচরো ক্রেতা দের কাছে বাজারে বসেই বিক্রি করি। যারা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন নিশ্চিতরূপেই জানেন! বাড়ি থেকে রাত সারে তিনটে পনে চারটে নাগাদ বেড় হই আমার একটি মোটরভ্যান বা ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ে। শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে খুব দ্রুত জন-মানব হীন পথের বাদশা হয়ে,- আমার মোটর ভ্যান আমার বাড়ি থেকে প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা পৌঁছে যায় বাইশ থেকে পঁচিশ মিনিটে! বিশেষ কারনে প্রতিদিন এক পথ দিয়ে যেতাম না! আজ এই পথে তো কাল অন্য পথে পরশু আর এক পথে! ভাবছেন এমন কেন করতাম? এমন করতাম এই কারণে যে আমাকে কেউ টার্গেট করতে না পারে! ভোরবেলায় জনহীন পথে দুইতিন জনের ছিনতাই বাজ ক-দিন লক্ষ্য করে একদিন আমার পথ আটকে আমার সাত রাজার ধন এক মানিক আমার পুঁজি-পাটা কষ্টের ছ-সাত হাজার টাকা কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য!

ভোর রাতের থেকে খেটে-খুটে সংসার টুকটাক চলে যায়। তা সেদিন যথারীতি শেষ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে আমার মোটরভ্যান চলেছে মাধবনিবাস হয়ে ভাগার বা ক্যান্টনম্যান্টের মধ্য দিয়ে গদি ফ্যাক্টারীর সামনে হয়ে উত্তম চন্দ্র স্কুলের সামনে দিয়ে মসজিদ মোড় হয়ে সোজা লালকুঠির ব্রিজ পার হয়ে আর্দালী বাজার হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে মণিরামপুর দুই পয়সার ফেরী ঘাট!
এই সময় আমার মতো আরো অনেক ক্রেতা এবং বিক্রেতা নীলগঞ্জের ওদিক থেকে শ্যাওড়াফুলী কাঁচাবাজারে সব্জি কিনতে এবং বেচতে যায়,যাদের অনেকের সঙ্গেই আমার খুব ভালো সম্পর্ক। সেদিন বোধকরি একটু আগেই বেড়িয়ে পরেছিলাম! তাই প্রথম বোট পেয়ে উঠে যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দেয় আর দেখতে দেখতে ওপারে অর্থাৎ শ্যাওড়াফুলীর দিকে পৌঁছে যাই। কিন্তু বোট থেকে জেঠিতে নামার ঠিক আগের মূহুর্তে আমার ব্যাক পকেটে হাত চলে যেতেই বুকটা কেঁপে ওঠে! পকেটে মানি ব্যাগ নেই! সাথে সাথেই বুঝতে বাকি রইলো না আমার মানিব্যাগ পেছনের পকেট থেকে মোটরভ্যানের ঝাকুনিতে আসতে আসতে পকেট থেকে উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় পড়ে যায়!

আমার মাথায় বাজ পড়ার মতো দশা হলো। তবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দ্রুত কতর্ব্য স্হির করতে চেষ্টা করলাম। মনে মনে ভাবলাম সারে ছয় হাজার টাকা সমেত আমার মানিব্যাগ আমার বাড়ি থেকে এই মণিরামপুর ঘাট পর্যন্ত কোথাও পরেছে, ঠিক করলাম এক্ষুনি আবার সেই রাস্তা ধরে ব্যাক করব হয়তো রাস্তায় কোথাও পড়ে রয়েছে আমি পেলেও পেতে পারি! আর ঈশ্বরের কাছে করুন আকুতি জানাতে থাকলাম,- যেন আমার কষ্টার্জিত টাকা সহ মানিব্যাগ পেয়ে যাই।
ওদিকে আমার দাদা কে ফোন করে সমস্ত কিছু বলে যে পথ ধরে আমি বাড়ি থেকে এসেছি সেই পথে একটু দেখতে দেখতে এগিয়ে আসতে বললাম,- আর আমি মোটরভ্যান নিয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরে ঈশ্বরের স্মরণাপর্ণ হয়ে ইষ্ট নাম জপতে জপতে একটু ধীরে ধীরে পথের দিকে দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম!
রাস্তা অনেকটাই অতিক্রম করে এসেছি! মণিরামপুর ছেড়ে, এস এন ব্যানার্জী রোড ছেড়ে এখন আর্ডালী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করব। ওদিকে আমার দাদাও সাইকেল নিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে এগিয়ে আসতে আসতে আমাকে ফোন করল, ভাবলাম বোধ হয় বলবে মানিব্যাগ টা পাওয়া গেছে! না দাদা আমাকেই জিজ্ঞাসা করল কোথায় এখন আর মানিব্যাগ পেয়েছি কিনা? আমি হতাশাজনক উত্তর দিয়ে ফোন টা কেটে দিই।

অর্ডালী বাজারের চৌমাথার মোর যেখানে দূর্গামন্দির ঠিক চৌমাথার মাঝখানে ভ্যাপারের তীব্র আলোর ছটায় সব কিছু সুস্পষ্ট দেখা যায় এমনকি একটি সুই পড়ে থাকলেও মনে হয় দেখাযাবে এমন স্বচ্ছ আলো! সেই খানে কিছু দূর থেকেই মনে হচ্ছে আমার মানিব্যাগ টি নিরবে আমার জন্য অপেক্ষা করছে! কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না সত্যিই কি আমার মানিব্যাগ! চৌমাথার মোরে পৌঁছে বুঝতে পারলাম আমারই মানিব্যাগ! পাশের দোকানের একটি সিঁড়িতে একটি লোক বসে আছেন। আমি আমার মোটরভ্যান দাঁড় করিয়ে নামলাম,- আর দূরু দূরুবুকে মানিব্যাগটি তুলে খুলে দেখলাম, দেখলাম আমার টাকা গুলো যেমন রাখা ছিলো তেমনি আছে! ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে ফোন করে খুশির আর উৎকণ্ঠা অবসানের ফোন করলাম আর জানিয়ে দিলাম আমার মানিব্যাগ টাকা সমেত স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গেছে! দাদা কিছু বকাঝকা করে সাবধানে যেতে বলল। আর আমি পুঃনরায় শেওড়াফুলী বাজারে যাবার জন্য আমার মোটরভ্যান ঘোরালাম।

আমার পরে পরে অনেকেই ঐ পথে যাওয়া-আসা করেছে, এক ব্যক্তি ঠিক পাশেই বসে থেকে পরে থাকা মানিব্যাগটির দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিলেন! কিন্তু কেউ টাকা ভর্তি মানিব্যাগটি তোলার কথা ভাবেন নি! আসলে মানিব্যাগটি অনেক দিনের পূরাতন আর জীর্ণ! ব্যাক পকেটে থেকে থেকে ঘামে ঘসায় ব্যাগটির দুট পিঠই ছিড়ে গেছিল! আমার স্ত্রী ব্যাগটি পাল্টাতে বলত,-কিন্তু আমি সুবিধা মতো দামে একটি ভালো মানিব্যাগ কিনতে পারছিলাম না বলে ওতেই কাজ চালিয়ে নিচ্ছিলাম! আর ঘাম থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে একটি একশো গ্রামের লাল-হলূদের নিউট্রলার প্যাকেটের মধ্যে ভাজ করে পুরে ব্যাবহার করতাম। যখন আত্মীয় পরিজনের মাঝে মানিব্যাগটি বেড় করতাম সকলে হাসতো! আর ওটা নিয়ে মজা করত, কিন্তু আমি সে সব হেসে উড়িয়ে দিতাম অথবা আরো মজাদার কথা বলে বিষয়টি হাল্কা করে দিতাম!

আজ যখন অমন জায়গায় টাকা সহ মানিব্যাগ পড়ে থাকা সত্বেও কেউ কুড়িয়ে না নেবার কারন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম ঐ নিউট্রলার লাল-হলুদ প্যাকেটটার জন্যই কেউ মানিব্যাগটি কল্পনা করতে পারেননি! নোংরা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক প্যাকেট বলে সকলের চোখে পড়েও তা প্রত্যাক্ষ্যাত হয়েছে আর আমার জন্য অপেক্ষা করেছে! হয়তো পাশেই বসে থাকা মানুষটাও ঐ লাল-হলুদ রঙের প্যাকেট টাকেই দেখছিল।
কিন্তু ঈশ্বর আমার কষ্টার্জিত অর্থ আমাকেই ফেরত দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আমি ঈশ্বর কে কৃতজ্ঞতা জানাবার পাশাপাশি অবহেলিত আর উপহাসের নিউট্রলার প্লাস্টিকের প্যাকেট টিকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

যে ছেড়া মানিব্যাগ আমি সহজে হাত ছাড়া করতে চাইনি,- সে নিজেও যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা রেখে গেল! তারও অনেক দিন পর আমার স্ত্রী আমাদের বিবাহ বার্ষিকি তে একটি মানিব্যাগ আমায় উপহার দিয়েছিলেন আর আমি আমার সেই মানিব্যাগটি পরিবর্তন করেছিলাম,-কিন্তু ফেলে দিইনি! সযত্নে রাখা আছে আমার বিছানার তোষকের নিচে! জীবনের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনার এও একটি, মনে থাকবে বহু দিন!

কোথায় চলেছি

--সমীর কর্মকার, ভারত

কাঁঠালবাগান বাজারে প্যাচপ্যাচে কাদা। তারই মাঝে খ্যাংড়া ঘ্যাচাং, মূর্তিমান বসে আছে, বেশ বড় বড়, পেট মোটা, ডিম ভর্তি, টেংরা মাছের ডালা নিয়ে। জিভে জল ঝরিয়ে হাপুস নয়নে সেদিকে তাকিয়ে আছি। কিনবো কি কিনবো না ভাবতে ভাবতে এক পা এগিয়ে এক পা পিছোচ্ছি। এমন সময় একটা ছেলে টাকুস করে প্রণাম করে ফেলল। ভালো আছেন স্যার? আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম এই কাদার মধ্যে প্রণাম কেন? সে বলল, স্যার ভুলে গেছেন, আজ শিক্ষক দিবস। আপনাকে ছাড়া আর কাকে প্রণাম করব। 'শিক্ষক দিবস'। কথাটা শুনে, মনের মধ্যে একটা রিনি রিনি তাল, সুর, লয় জেগে উঠলো। মনে পড়ে, ছেলেদের কত হাসি কান্না, দুষ্টুমি, ভালোবাসা, ভালো লাগার কথা। একবার বায়োলজি স্যার, ক্লাসে, গুরু গম্ভীর গলায় মাইটোকনড্রিয়ার বিবরণ দিয়ে চলেছেন। এমন সময়, ভোঁদকা মতো একটি ছেলে বলে উঠলো। স্যার, একটা কথা বলব? স্যার বললেন। বল। ছেলে বলল, স্যার, পেপারে বেরিয়েছে, গতকাল বেনারসে, একটা ট্রেনইঞ্জিন তার বগিগুলো কে না নিয়েই হুস হুস করে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পেরে ইঞ্জিন থামিয়ে পিছনে আসে। স্যার, ড্রাইভার কি করে বুঝেছিলো, যে বগিগুলো খুলে গেছে? পড়ানোর মাঝে, বেমক্কা, এরকম উদ্ভট প্রশ্নে, স্যারের মেজাজ বেজায় গরম। ছেলেরা বুঝে গেল, ভোঁদকা এখন কেস খাবে। স্যার বললেন, আচ্ছা তুই তোর বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে রাস্তায় যাচ্ছিস। এমন সময়, তোর প্যান্ট খুলে পড়ে গেল, তুই কি করবি? কি করে বুঝবি, প্যান্ট খুলে গেছে? সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়লো। বোকা ছাত্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, ধপাস করে বসে পড়ল। স্যারের মাইটোকনড্রিয়া, প্রবল বিক্রমে, পুনরায় পথ চলতে শুরু করল।

মনে পড়ছে, এরকম কত মজাদার কথা। সে সব বিদ্যালয়ে পড়ানোর কথা। 'শিক্ষক দিবস' । আজ মনে পড়ছে আট বছর আগেকার এক দিনের কথা। তখন আমিও তো এখানকার এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। এখন রিটায়ার্ড। সেদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ছাত্ররা অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। প্রতিবছরের মতো, সিনিয়ার ছাত্ররা, জুনিয়ার ছাত্রদের ক্লাস নিত। নাইন, টেন, ইলেভেন, এবং টুয়েলভ এর ছাত্ররা সিক্স, সেভেন ওএইট এর ক্লাস নিতে পারতো। সেবারও তারা প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিওডের ক্লাস নিয়েছিল। মাঝে মাঝেই একদল ছাত্র টিচার্স কমন রুমে, লাইন দিয়ে ঢুকছিল, শিক্ষকদের প্রণাম করতে ও বিভিন্ন রকমের উপহার, শিক্ষকদের হাতে তুলে দিতে। কেউ কেউ নিয়ে এসেছিল বই। তবে বেশিরভাগ ছাত্রই নিয়ে এসেছিল, বিভিন্ন রকমের পেন আর ফুলের তোড়া। সমস্ত শিক্ষকদের পকেটে, প্রচুর পেন জমা হচ্ছিল, একের পর এক। আর হাত ভরে যাচ্ছিল ফুলের তোড়ায়। বেশিরভাগই, ছোট ছোট, একটা কি দুটো ফুল দিয়ে তৈরি উপহার। পড়ানো শেষে সমস্ত ছাত্ররা একজোট হয়েছিল হলঘরে।
সেখানে ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাতে কেউ গান, কেউ আবৃত্তি আবার কেউ বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানায়। এরপর স্কুলের স্পেশাল টিফিন। তাতে স্কুলের পক্ষ থেকে, সমস্ত শিক্ষককে, মিষ্টির প্যাকেট, ছাত্ররা তুলে দিয়েছিল সমস্ত শিক্ষকের হাতে। এরপর ছিল মহা কোলাহল ও মহা আনন্দের মহা ফুটবল খেলা। ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের প্রতিযোগিতা। তবে প্রতিযোগিতায় আনন্দ পাওয়াটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছাত্ররা ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ছিল বল নিয়ে। অংকের স্যার বড্ড বেয়াড়া। তাই বিশাল বপুর, দুষ্টু প্রণব, জাতে রাবণ, এই সুযোগে, অংকের স্যারের ঠ্যাংয়ে, ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল মাঠের মাঝে, আর ভেজা মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে, সারা গায়ে কাদা মেখে, অংকের স্যারের সে এক মজাদার কীর্তি। এই অঙ্কের স্যার ছিলেন ছাত্র-শিক্ষকদের অতি জনপ্রিয় এক রসিক ব্যক্তিত্ব। স্যার, বালি স্টেশন থেকে বিদ্যালয় আসতেন, কোনদিন পায়ে হেঁটে, কোনদিন রিকশায় চেপে। সেদিন রিক্সায় চাপতে যেতেই, রিক্সাওয়ালা বলল, স্যার আজ থেকে 10 টাকা দিতে হবে। স্যার থমকে দাঁড়ায়। বলে ৭ টাকা থেকে 10 টাকা। রাস্তাটা হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল কি করে? আমি সাত টাকাই দেবো। রিক্সাওয়ালা বলল, তাহলে স্যার আপনাকে মাজার পেরিয়েই নামিয়ে দেবো। স্যার ও ছাড়ার পাত্র নয়। বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তবে মাজার পেরিয়ে, যত জোরে পারবে, প্যাডেলে চাপ দেবে। তারপর গড়িয়ে, গড়িয়ে, গড়িয়ে, গড়িয়ে,যেখানে গিয়ে থামবে, আমি সেখানেই নেমে যাব। রিক্সাওয়ালাও বেশ মজা পেয়েছে। বলে তাই হবে স্যার। রিক্সা চলতে শুরু করল। মাজার পেরিয়ে, বেমক্কা প্যাডেলে চাপ দিল রিকশাতে। গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে গিয়ে থামল মসজিদের কাছে। সাত টাকা গুঁজে দিয়ে ঝপাং করে লাফ দিয়ে নেমে পিছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে সোজা হেঁটে চললেন মাস্টারমশাই। পিছনে বড় বড় অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিক্সাওয়ালা ।
এদিকে বেয়াড়া বলটা, কেন যেন ছাত্রদের পায়ে পড়তেই পেল না। তার আগেই ছাত্ররা ভুল করে অন্যদিকে চলে গেল। আর বল গিয়ে পড়লো, শিক্ষকমশাইয়ের পায়ে। শিক্ষকমশাই, তার অসামান্য পারদর্শীতা দেখিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রতিপক্ষের গোলের দিকে। সামনে দৌড়ে এল ছাত্ররা। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল প্রানপনে। তবে প্রাণভরা প্রাণে, প্রাণ ছিল কম। তাই শিক্ষকমশাই, অসামান্য উদ্যোমে, যত জোরে পারেন লাথিয়ে, গোলে বল পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু, বলতো, ছাত্রের মত শিক্ষকমশাইয়ের কথা শুনলো না। চলে গেল কখনো ডাইনে কখনো বামে। বেচারা শিক্ষকমশাই, ফিরে এলেন ভগ্ন মনোরথে। মাঠ জুড়ে উচ্চ হাসির ঢেউ, ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। শেষমেষ, হয়তো ছাত্রদের ভুলে, বল কখনো বা ঢুকে গেল ছাত্রদের গোলে। জিতে গেল শিক্ষক সমাজ। এ আনন্দ, এখনো প্রাণ মন ভরিয়ে দেয়। খেলা শেষে ঘরে ফেরার পালা।
সেদিন মহা-আনন্দে বিদ্যালয় থেকে বাড়ির পথ ধরে ছিলাম, একমাত্র সঙ্গী সাইকেলে চেপে। আসার পথ, প্রায় দেড় কিলোমিটার। এই পথে যত ছোট ছোট বাচ্চা দেখেছি, পকেট থেকে, উপহার পাওয়া, পেন বা ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছি তাদের ছোট্ট হাতে। পেন বা ফুল পেয়ে ছোট্টু সোনাদের সে কি আনন্দ। তাদের হাসি ভরা মুখ মনে পড়লে, আজও প্রাণমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। এভাবে, আস্তে আস্তে রেললাইন পেরিয়ে, ছোট্ট গলির পথে, মাখলায়, বাড়ির দিকে যখন আসছিলাম, তখন পকেট এ আর কোন পেন অবশিষ্ট ছিল না, পড়েছিল কয়েকটা ফুল।
গলির পথে মাখলা হাইস্কুলের একটা ছেলেকে আসতে দেখলাম। তার কাছে এসে, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই, চোখে পড়ল, তার পরনের জুতো জোড়া। অনেকটা ছেঁড়া, মোজা বেরিয়ে এসেছে। তাকে দেখে খুব কষ্ট পেলাম। পকেটএ হাত দিলাম যদি একটা পেন পাওয়া যায় কিন্তু পড়েছিল কয়েকটা ফুল। ফুল তাকে দিতে মন চাইল না। পকেটে হাত দিয়ে একটা 100 টাকার নোট বার করলাম। তাকে ডেকে বললাম, তোর নাম কিরে? সে বলল, স্যার, আমার নাম রুপেন। স্যার, বলাতে বুঝলাম, সে আমাকে চেনে। তার হাতে 100 টাকা দিয়ে বললাম, বাবা, তোর জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। এটা দিয়ে কাল একজোড়া জুতো কিনে নিবি। কথাটা শুনে, তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। ভাবলাম তার দারিদ্র্যকে হয়তো আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু দেখলাম না, তা নয়। ছেলেটা বলল, স্যার, ছেঁড়া জুতো পরে আমি চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু মায়ের খুব অসুখ। ওষুধ কিনতে পারিনি। এই 100 টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে মায়ের ওষুধ কিনবো। আমার দুচোখে জলের ধারা বাধা মানতে চাইছিল না। কিন্তু কোনোমতে নিজেকে সামলিয়ে, হাত দিয়ে সম্মতি জানালাম।কোন কথা বলতে পারলাম না। ছেলেটা টাকা নিয়ে তার পথ ধরল। আমি তার পথ পানে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। এই আমার দেশ? এখানেই আমি বাস করি? এভাবেই আরো কত কাল আমাকে চলতে হবে? আমাদের চলতে হবে এভাবেই.....

সেখানে ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাতে কেউ গান, কেউ আবৃত্তি আবার কেউ বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানায়। এরপর স্কুলের স্পেশাল টিফিন। তাতে স্কুলের পক্ষ থেকে, সমস্ত শিক্ষককে, মিষ্টির প্যাকেট, ছাত্ররা তুলে দিয়েছিল সমস্ত শিক্ষকের হাতে। এরপর ছিল মহা কোলাহল ও মহা আনন্দের মহা ফুটবল খেলা। ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের প্রতিযোগিতা। তবে প্রতিযোগিতায় আনন্দ পাওয়াটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছাত্ররা ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ছিল বল নিয়ে। অংকের স্যার বড্ড বেয়াড়া। তাই বিশাল বপুর, দুষ্টু প্রণব, জাতে রাবণ, এই সুযোগে, অংকের স্যারের ঠ্যাংয়ে, ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল মাঠের মাঝে, আর ভেজা মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে, সারা গায়ে কাদা মেখে, অংকের স্যারের সে এক মজাদার কীর্তন। এই অঙ্কের স্যার ছিলেন ছাত্র-শিক্ষকদের অতি জনপ্রিয় এক রসিক ব্যক্তিত্ব। স্যার, বালি স্টেশন থেকে বিদ্যালয় আসতেন, কোনদিন পায়ে হেঁটে, কোনদিন রিকশায় চেপে। সেদিন রিক্সায় চাপতে যেতেই, রিক্সাওয়ালা বলল, স্যার আজ থেকে 10 টাকা দিতে হবে। স্যার থমকে দাঁড়ায়। বলে ৭ টাকা থেকে 10 টাকা। রাস্তাটা হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল কি করে? আমি সাত টাকাই দেবো। রিক্সাওয়ালা বলল, তাহলে স্যার আপনাকে মাজার পেরিয়েই নামিয়ে দেবো। স্যার ও ছাড়ার পাত্র নয়। বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তবে মাজার পেরিয়ে, যত জোরে পারবে, প্যাডেলে চাপ দেবে। তারপর গড়িয়ে, গড়িয়ে, গড়িয়ে, গড়িয়ে,যেখানে গিয়ে থামবে, আমি সেখানেই নেমে যাব। রিক্সাওয়ালাও বেশ মজা পেয়েছে। বলে তাই হবে স্যার। রিক্সা চলতে শুরু করল। মাজার পেরিয়ে, বেমক্কা প্যাডেলে চাপ দিল রিকশাতে। গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে গিয়ে থামল মসজিদের কাছে। সাত টাকা গুঁজে দিয়ে ঝপাং করে লাফ দিয়ে নেমে পিছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে সোজা হেঁটে চললেন মাস্টারমশাই। পিছনে বড় বড় অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিক্সাওয়ালা ।

এদিকে বেয়াড়া বলটা, কেন যেন ছাত্রদের পায়ে পড়তেই পেল না। তার আগেই ছাত্ররা ভুল করে অন্যদিকে চলে গেল। আর বল গিয়ে পড়লো, শিক্ষকমশাইয়ের পায়ে। শিক্ষকমশাই, তার অসামান্য পারদর্শীতা দেখিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রতিপক্ষের গোলের দিকে। সামনে দৌড়ে এল ছাত্ররা। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল প্রানপনে। তবে প্রাণভরা প্রাণে, প্রাণ ছিল কম। তাই শিক্ষকমশাই, অসামান্য উদ্যোমে, যত জোরে পারেন লাথিয়ে, গোলে বল পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু, বলতো, ছাত্রের মত শিক্ষকমশাইয়ের কথা শুনলো না। চলে গেল কখনো ডাইনে কখনো বামে। বেচারা শিক্ষকমশাই, ফিরে এলেন ভগ্ন মনোরথে। মাঠ জুড়ে উচ্চ হাসির ঢেউ, ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। শেষমেষ, হয়তো ছাত্রদের ভুলে, বল কখনো বা ঢুকে গেল ছাত্রদের গোলে। জিতে গেল শিক্ষক সমাজ। এ আনন্দ, এখনো প্রাণ মন ভরিয়ে দেয়। খেলা শেষে ঘরে ফেরার পালা। সেদিন মহা-আনন্দে বিদ্যালয় থেকে বাড়ির পথ ধরে ছিলাম, একমাত্র সঙ্গী সাইকেলে চেপে। আসার পথ, প্রায় দেড় কিলোমিটার। এই পথে যত ছোট ছোট বাচ্চা দেখেছি, পকেট থেকে, উপহার পাওয়া, পেন বা ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছি তাদের ছোট্ট হাতে। পেন বা ফুল পেয়ে ছোট্টু সোনাদের সে কি আনন্দ। তাদের হাসি ভরা মুখ মনে পড়লে, আজও প্রাণমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। এভাবে, আস্তে আস্তে রেললাইন পেরিয়ে, ছোট্ট গলির পথে, মাখলায়, বাড়ির দিকে যখন আসছিলাম, তখন পকেট এ আর কোন পেন অবশিষ্ট ছিল না, পড়েছিল কয়েকটা ফুল। গলির পথে মাখলা হাইস্কুলের একটা ছেলেকে আসতে দেখলাম। তার কাছে এসে, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই, চোখে পড়ল, তার পরনের জুতো জোড়া। অনেকটা ছেঁড়া, মোজা বেরিয়ে এসেছে। তাকে দেখে খুব কষ্ট পেলাম। পকেটএ হাত দিলাম যদি একটা পেন পাওয়া যায় কিন্তু পড়েছিল কয়েকটা ফুল। ফুল তাকে দিতে মন চাইল না। পকেটে হাত দিয়ে একটা 100 টাকার নোট বার করলাম। তাকে ডেকে বললাম, তোর নাম কিরে? সে বলল, স্যার, আমার নাম রুপেন। স্যার, বলাতে বুঝলাম, সে আমাকে চেনে। তার হাতে 100 টাকা দিয়ে বললাম, বাবা, তোর জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। এটা দিয়ে কাল একজোড়া জুতো কিনে নিবি। কথাটা শুনে, তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। ভাবলাম তার দারিদ্র্যকে হয়তো আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু দেখলাম না, তা নয়। ছেলেটা বলল, স্যার, ছেঁড়া জুতো পরে আমি চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু মায়ের খুব অসুখ। ওষুধ কিনতে পারিনি। এই 100 টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে মায়ের ওষুধ কিনবো। আমার দুচোখে জলের ধারা বাধা মানতে চাইছিল না। কিন্তু কোনোমতে নিজেকে সামলিয়ে, হাত দিয়ে সম্মতি জানালাম।কোন কথা বলতে পারলাম না। ছেলেটা টাকা নিয়ে তার পথ ধরল। আমি তার পথ পানে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম। এই আমার দেশ? এখানেই আমি বাস করি? এভাবেই আরো কত কাল আমাকে চলতে হবে? আমাদের চলতে হবে এভাবেই

একটু জল পাই কোথায়, বলতে পারেন?

- অগ্নিভ সেনগুপ্ত, নেদারল্যান্ড

নেদারল্যান্ড ঠিক কিভাবে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করে এবং সুস্থ পরিবেশ তৈরিতে সাধারন মানুষের সদিচ্ছা ও সর্বোপরি সক্রিয় ভূমিকা ঠিক কতখানি...অগ্নিভ সেনগুপ্ত

ইদানীং, পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। একসময়ে মানুষ পরিবেশকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে, আর সময়বিশেষে প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। আমরা যখন স্কুলে ছিলাম, ইকো-সিস্টেম সম্বন্ধীয় পাঠ্য বাধ্যতামূলক ছিল, যাতে ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির সাথে আমাদের এক নিবিড় যোগ গড়ে ওঠে। যাতে আমরা প্রকৃতির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে শিখি। তবে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বার্থে প্রকৃতিকে আমরা বারংবার আমরা বলিকাঠে চড়িয়েছি। গাছ না কাটলে কাগজ পাবো কোথা থেকে? আগুন না জ্বালিয়ে উৎপাদন-শিল্প গড়ে উঠবে কি ভাবে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশনে এখনো বহু জায়গায় সি-এফ-সি (ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন) ব্যবহৃত হয়, যা ওজোন লেয়ারকে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তা ছাড়া, যুদ্ধ তো আছেই। কোথায় যেন পরেছিলাম, মানুষ কিলার-এপ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাই যুদ্ধ মানুষের মজ্জাগত। জনজীবন এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি তো ছেড়েই দিলাম, যুদ্ধ মানে প্রাকৃতিক সম্পদেরও প্রভূত ক্ষতি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাব নিরক্ষীয় দেশে তো বটেই, ইয়োরোপের মতো আপাত-শীতপ্রধান মহাদেশেও প্রকট হয়ে উঠছে। নেদারল্যান্ডসের মতো উত্তর-পশ্চিমের দেশেও গ্রীষ্মকালে পারদ ৩৫ ডিগ্রি ছাড়াচ্ছে মাঝেমধ্যেই, আর ইয়োরোপের পশ্চিম বা দক্ষিণের দেশগুলোর কথা তো ছেড়েই দিলাম। ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশে এই বছর প্রবল তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস আছে, যার ফলে জনজীবন প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সোশাল মিডিয়া ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আমরা সবাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল জলকষ্টের খবর পেয়েছি। মাটির তলার জলাধার প্রায় নিঃশেষিত, নদী-পুকুর ইত্যাদির জল আমরা এতো দূষিত করেছি যে তা ব্যবহারের যোগ্য নয়। রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ নির্দ্বিধায় আমরা পুকুর-নালা-নদীতে ফেলছি, খাল-পুকুর বুজিয়ে ফেলে সেখানে বহুতল বাড়ি তৈরী করছি, আর, আপনার ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, পূজার উপাচার বা মূর্তি বিসর্জনেও জলকে দূষিত করে তুলছি। তার সাথে যোগ হয়েছে ব্যবহৃত জলকে রিসাইকেল করে পুনঃব্যবহারের উপযোগী করে তোলার পরিকাঠামো এবং সদিচ্ছার অভাব। পানীয় জলের একমাত্র সূত্র – আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, যা আমরা এতোদিন ব্যবহার করে এসেছি, তা তো একদিন শেষ হওয়ারই ছিল! সেই ভূগর্ভস্থ জলকে ব্যবহার করার আগেও আমরা ওয়াটার-পিউরিফায়ারে তাকে পরিশুদ্ধ করছি, কারণ সময়বিশেষে দূষণের অংশ সেখানেও বিদ্যমান। আজ আমরা যেই পৃথিবীতে বাস করছি, সেখানে বাতাস দূষিত, খাদ্য দূষিত, এমনকি পানীয় জলও দূষিত – ভয়াবহ সময়।

এক রসিক জলাতঙ্ক রোগীর গল্প শুনেছিলাম, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তিনি 'Rime of Ancient Mariner'-এর সেই লাইনদুটো আউড়ে যেতেন, 'Water, water, everywhere, nor any drop to drink.' আমাদের পরিণতিও কি সেই রোগীর মতোই হতে চলেছে, যেখানে পুকুর-নদী-ভর্তি জল আর আমাদের পানের উপযুক্ত থাকবে না কিছুদিনের মধ্যেই?
যাক, দূষণ-জলকষ্ট ইত্যাদি নিয়ে আপনাদের জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশী, তাই সেই বিষয় নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখাটা উদ্দেশ্য নয়। আগের প্রস্তাবনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নেদারল্যান্ডসের দূষণ ও পানীয় জল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের জানানো।

প্রথমে আসি দূষণ-নিয়ন্ত্রনে। যেমন আপনারা অনেকেই জানেন, নেদারল্যান্ডসে সাইকেলের সংখ্যা জনসংখ্যার থেকে বেশী। এখানকার বেশীরভাগ মানুষ কাছেপিঠে যেতে গেলে, এমনকি অফিস যেতে গেলেও সাইকেলে যেতেই বেশী পছন্দ করেন। তার দুটো উপকার, প্রথমত শরীরচর্চা, আর দ্বিতীয়ত দূষণরোধ। এখানে সরকারের তরফ থেকেও সাইকেল-আরোহীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, যেমন এক বিস্তির্ণ এবং ব্যাপৃত সাইকেল-লেন, গাড়ী বা অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় রোড-প্রায়োরিটি ইত্যাদি। নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীরও নাকি অফিস যাওয়ার প্রধান পরিবহন সাইকেল! সহজ হিসাব, গাড়ীর ধোঁয়া কম ইজ ইকুয়াল টু দূষণ কম।

এখানে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের চল খুব। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতেও ময়লা ফেলার তিনটে আলাদা জায়গা – অর্গ্যানিক ওয়েস্ট, যেমন রোজকার সবজি বা ফলের খোসা, ডিমের খোলা, মাছ-মাংসের কাঁটা ইত্যাদি, পেপার ওয়েস্ট, যেমন কাগজপত্র, প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি এবং প্ল্যাস্টিক ওয়েস্ট, যেমন দুধের ক্যান, প্ল্যাস্টিক-ব্যাগ ইত্যাদি। তা ছাড়া কাঁচের জিনিষ ফেলার আলাদা ব্যবস্থা, আর বড় কোন ডিসপোসেবল, যেমন ভেঙে-যাওয়া চেয়ার, কম্প্যুটার, বড় লোহার কোন জিনিষ ইত্যাদির জন্যে নির্ধারিত জায়গা আছে, যেখানে আপনাকে গিয়ে ফেলে আসতে হবে। সমস্ত ধরণের আবর্জনা আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে রিসাইক্লিঙের সুবিধা – অর্গ্যানিক ওয়েস্ট চলে গেল ক্ষেতের সার হিসাবে, পেপার ওয়েস্ট চলে গেল পেপার মিলে, আর প্ল্যাস্টিক বা লোহার ওয়েস্ট দিয়ে নতুন আসবাব বা কন্টেনার তৈরী হয়ে গেল। সহজ, অথচ কার্যকর।
আর, এই রিসাইক্লিঙের জন্যে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্য করে প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে। যদি আপনি উপকার পান, একটু বেশী ট্যাক্স দিতে আপত্তি কোথায়?

পানীয় জলের ক্ষেত্রেও একই বিধান – রিসাইক্লিং। নেদারল্যান্ডসে ৯৯% মানুষ শুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা উপভোগ করে। এই দেশে প্রথম এসে যেটা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল, এখানকার সাধারণ কলের জলও পানের উপযোগী, যা ভারতে ভাবাই যায় না। অ্যাকোয়াগার্ড বা অন্যান্য ওয়াটার পিউরিফায়ারের কোন প্রয়োজন নেদারল্যান্ডসে নেই। বৃষ্টির জল, বা আপনার বাড়ীর বর্জ্য জল, বা ক্যানালের জল – পরিশুদ্ধ হয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যায় ব্যবহারের জন্যে। ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এই দেশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রথমত সমুদ্রপৃষ্টের নীচে অবস্থানগত বিপত্তি এড়াতে, আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেক পরিবারের জন্যে শুদ্ধ পানীয় জল, সেচের জন্যে পর্যাপ্ত জল ইত্যাদি যোগান দেওয়ার জন্যে। জল পরিষেবাও সাধারণ ট্যাক্সের আওতায় পড়ে, আর প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোটের মাধ্যমে ওয়াটার বোর্ড তৈরী হয় এই পরিষেবাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্যে। সরকারী প্রচেষ্টা ও পরিকাঠামো তো আছেই, তার সাথে যোগ হয়েছে সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা। এই দেশে গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মতো পবিত্র নদ বা নদী নেই, আর হয়তো সেই কারণেই বিভিন্ন আবর্জনা, পুজোর ফুল ইত্যাদি ফেলে কেউ এখানকার জলাধার দূষিত করে না। ভারতবর্ষে শর্পাঘাতে কারোর মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহ দাহ করা হয়না, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ওই, লক্ষীন্দরকে বেহুলা গিয়ে যমালয় থেকে ফেরত নিয়ে আসবে, সেই আশায়। লক্ষীন্দর ফেরে না, শুধু সেই পচা-গলা মৃতদেহের জীবাণু জলে মিশে সেই জলকে ধারণের অযোগ্য করে তোলে। নেদারল্যান্ডসে কুসংস্কার কম, তাই হয়তো সংস্কার বেশী।

ইয়োরোপের বেশীরভাগ দেশই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের সুফল এবং কুফল, দুই-ই ভোগ করেছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দেখেছে। আর, সেই কারণেই হয়তো প্রকৃতি সংরক্ষণে এরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আজ ভারতবর্ষের জলকষ্ট খবরের শিরোনামে, আশা রাখি কালকের সমাজে জল-সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে "ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

মশার ধোঁকাবাজি

--দেবলীনা পাড়িয়া, ভারত

রাত্তিরে কাল খাওয়ার পরে একটু ছিলাম বসে,
একটা মশা পনপনিয়ে উড়ছিল আশপাশে।
তাক বুঝে ঠিক খপাৎ করে যেই ধরেছি তাকে,
ওমনি বুঝি মরল ব্যাটা হাতের মুঠোর ফাঁকে!
তারপরেতে যেই ভেবেছি মরল তো ঠিক করে?
একটুখানি দেখতে গেলাম মুঠোটা ফাঁক করে;
ওমনি দেখি ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল পাজি,
মশাও শেষে শিখেই গেল এমন ধোঁকাবাজি!

একটি মেয়ের কথা

--স্বাতী রায়, ভারত

গতকাল কিন্তু আজকের স্মৃতি , আগামীকাল আজকের স্বপ্ন। পৃথা একটি ছোট মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের সুন্দর কাজ করে। মনের মধ্যে অগোছালো স্বপ্ন এই হাতের কাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। ছোট তো তাই ভাবনা ঠিক পরিস্ফুট নয়। ভাবে অনেক কিছু কিন্তু সাজিয়ে উঠতে পারে না। নিজের হাতে সুন্দর মালা গাঁথে, কানের দুল বানায়, মাটির মূর্তি গড়ে। টেরাকোটার কাজ করে। ঘরের দেওয়ালে রঙ বেরঙের ছবি আঁকে ।মনে দৃঢ় সংকল্প আর কঠোর পরিশ্রমকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছে। তাই পৃথার এই প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্খা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। রইল অনেক ভালোবাসা।

সাধ

--স্বপন মজুমদার, ভারত

যে দীপ জ্বালাতে গিয়ে
বিরুদ্ধতার বাতাসে
হয়েছি বিফল।
যেদিন আমার যাত্রা হবে শেষ
জ্বালিও সে দীপ, অন্তরে
শিখাহীন,ধোঁয়াহীন সে অনলে হবো ভস্ম।

যে ধূপের সুগন্ধ পারিনি নিতে
আমারই বিলম্বতায়,
জ্বেলে দিও সমাধির প্রান্তে
একটু ভালবাসায়।

হয়তো বা চকিতে পড়িবে মনে
ছিলাম পথের সাথী,
একই পথে,একই মিছিলে
সেই ক্ষণে ভুলিও মোর ভুল-ভ্রান্তি।

ক্রমে ক্রমে সময়ের ধূলিতে
মুছে যাবে
স্রোতের অমোঘ টানে বালির সে রেখা
হবে অস্পষ্ট,
মনের ক্ষোভ-বিক্ষোভ রাখিব না মনে
সময়ের চাকা,থাকিবে না অপেক্ষায়
চলিবে সামনের দিকে
সে পথে হয়তো আমি নেই.....

আমার আমি আর নেই
সমবেত স্রোত আনিবে নতুন যুগ,
অলক্ষ হইতে স্বাগত করি
আমার স্বপ্ন পূরণ কে।

নতুন প্রেম

- আবীরা চৌধুরী, ভারত

রামধনু মাখা দিনগুলো ধূসর বিষণ্ণতার আড়ালে উঁকি মারে,
বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত একটা নাম হঠাৎ ভেসে ওঠে মনমাঝারে।
হৃদ-সমুদ্রের বালুচরে এখনো ছড়িয়ে আছে মান-অভিমানের নুড়িপাথর,
মনখারাপের মেঘ এখনো জমাট বাঁধে,
আলগোছে জড়িয়ে থাকে কুয়াশাঘন কষ্টের চাদর।
দীর্ঘদিন পর পরিচিত মুখখানি আচমকা দাবি করে অনায্য প্রবেশাধিকার,
বাধানিষেধের গন্ডি অতিক্রম করতে চেয়ে প্রশ্ন তোলে কিছু পুরাতন অঙ্গীকার ।
ভালোবাসার কাঙাল তো সবাই, মনের আগল তাই সহজেই ভাঙতে বসে,
কিন্তু রক্তাক্ত মুহূর্তদের কি সত্যিই ভুলে যাওয়া যায় শুধুমাত্র আবেগের বশে?
সুখস্মৃতির গায়ে আজও যে জেগে আছে যন্ত্রণার নীল কালশিটে দাগ,
চিঠিপত্রগুলো খামে ভরে , মনের বন্ধ আলমারিতেই তুলে রাখা থাক।
ফিরে আসা সহজ নয়, ফিরিয়ে দেওয়া হয়তো আরো কঠিন,
অগুনতি চাওয়ার তালিকায় চোখ মেলে থাকে না-পাওয়ার গ্লানি সীমাহীন।
তবুও আছে প্রত্যয়, ভাঙাচোরা মন আবার লাগবে জোড়া নতুন প্রেমের ছোঁয়ায়,
নিঃসঙ্গতার প্রাচীর ভেঙে ঢুকবে দেখো ভালোবাসার মিঠে আলো;
আত্মপ্রেম নিশ্চয় হবে বাঙ্ময়।

নেশাঘোর

-স্নেহাংশু বিকাশ দাস, ভারত

জ্বর ও মনখারাপের বিকেলগুলোয়
আমার চশমা হারিয়ে যায়
স্তনোচ্ছ্বাসের শব্দ ও মেঘবর্ণ পাঁজর নিয়ে
একটা থমথমে হাওয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ি
অসময়ুদ্ধে যতবার নিজেকে এগিয়ে দিয়েছি
থার্মোমিটার নরম হয়ে পড়েছে
স্পর্শ করেছে ভেতরের কালশিটে
কখনও বিজ্ঞাপন বিরতির পরে
মুছিয়ে দিয়েছে ধু-ধু মরুভূমি
সেইসব দিনে রাস্তা ভুলে যেতে ইচ্ছে করে
কোথা থেকে যেন এসে পড়ে গতজন্মের কুয়াশা
কারণে অকারণে খুঁচিয়ে তোলে একঘেয়ে ক্ষত
হিমসন্ধ্যায় শরীরময় সেতারের অলীক মূর্ছনা
এলোমেলো করে দেয় আমার সমস্ত প্রতিরোধ
কেউ আর স্মৃতি আঁকবে না চোখে
সমস্ত রঙ হারিয়ে ফেলবে দূর লোকালয়
নেশাঘোরে অন্ধ হয়ে যাবে দেবদারু পাতা..

অর্জন

--সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, ভারত

যদ্দূর ভিখারি থেকেছি, ঘনঘোর হাসির বাচ্চাদের নিয়ে
আমার সংসার ছিল পৌষের রাতের মতো হিম
তারপর কত ছাইচাপা কুমারীর সুপেয় তরল গড়িয়ে নামল
আমাদের নদীমাতৃক দেশে—বিংশশতকের গোড়ায়
সেই ধারা দেখে আমার চৈতন্য হল এক নিমগাছের নীচে
আর নীচে নামতে নামতে আমি পুনরায়
গর্ভের ভেতর সাঁতার দিলাম কবোষ্ণ জলে

মণিহারা চক্ষুদুটি নিয়ে সে-কী উল্লাস, যেন ছায়াচর
যেন রাতের সতর্ক পেঁচার দল শিকার নিয়ে এসে
আমার সদ্য ফুটে-ওঠা মুখে ভরে দিচ্ছে ওমফল—তুলতুলে আরামপ্রদ
জিভে লাগতে না লাগতেই সে-সব গলে গিয়ে পাহাড় থেকে নামল ধস
বরফে ঢেকে গেল ওই ছোট্টো পাহাড়িয়া গ্রাম
প্রতিটি ঘর থেকে, কাঠের ঘর থেকে, অন্ধকারে বেরিয়ে এল
রোডোডেনড্রন ফুলের লাল মদ, আর সেই সুপেয় তরল এসে থামল
সব ছাইচাপা কুমারীর জন্মদ্বারের কাছে

কী দৈবাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল সেই
সর্বদেহে জ্বালা নিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম ভিক্ষাপাত্র হাতে
দেখি একটি-দুটি নিমফল ছাড়া এজন্মে কোনও কিছুই উপার্জন হয়নি আমার

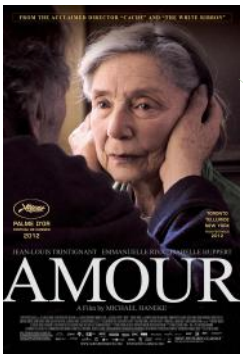

স্বপ্নে পাওয়া ক্যাথারসিস

'Amour'

by Michael Heneke

গত পঞ্চাশ বছরের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার ছবি

--সব্যসাচী ভৌমিক, ভারত

কাফকার 'ক্যাসল' যখন মাইকেল হ্যানেকের হাতে পুনর্নির্মিত হয়, সেই গথিক আইডেন্টিটির শরীরে গেঁথে দেন আধুনিকতার অবক্ষয়গুলি, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তার হাঁটা একটা অব্যক্ত ভালোবাসার দিকেই। সেই ভালোবাসা সর্বনাম ছাড়া এলো Amour ছবিতে। Amour শব্দের অর্থ ভালোবাসা। কিন্তু মাইকেল হ্যানেকের Amour ছবিটি সেই অর্থে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা নয়। আমাদের চেনা নারী, গার্হস্থ্যের আলপনা, সঙ্গীতের ঋতু নিয়ে যখন স্বপ্নে পাওয়া ক্যাথারসিস তৈরী হয়, একজন মাইকেল হ্যানেকে এমন ভালোবাসার জন্ম দেন। নিঃসঙ্গতার সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ, নৈঃশব্দের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ছায়াতর মেঘের নিচে হারিয়ে যাওয়া, এমন অনেক ম্যাজিকই ঘটে যায় ভালোবাসা শব্দের আড়ালে। হ্যানেকে আমাদের হাত ধরে এমন এক পরিণতি দেখান, আমরা স্তব্ধ, সম্মোহিত হয়ে যাই সেই এন্ড ক্রেডিটসের সামনে ।

আমার মতে, মাইকেল হ্যানেকেই এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরিব্রাল ফিল্মমেকার। তাঁর জাম্প কাট, ক্রস ডিসলভ, প্যানিং, সাইলেন্স সবকিছুর পিছনেই থাকে এক চর্চিত মস্তিস্ক। Amour কিন্তু তাঁর মেধার বিজ্ঞাপন নয়। তিনি 'হোয়াইট রিবন' সিনেমায় পরিচিত উপকথার অস্তিত্বে ভিন্ন ভিন্ন স্পেকট্যাকল তৈরী করেন। 'ফানি গেমস' এ নিষ্ঠুরতাই যেন কার্নিভ্যাল, মহত্বের স্পনসররারা এখানে ব্রাত্য। আবার 'সেভেন্টি ওয়ান ফ্র্যাগমেন্টস অফ আ ক্রনোলজি অফ চান্স' ছবিতে (যা আমার হ্যানেকের সবচেয়ে প্রিয় ছবি) অনেকানেক ঘটনার ফেব্রিকেশনে চরম আর্থ সামাজিক বিপন্নতার সামনে দাঁড় করান।

Amour সেই চেনা সেরিব্রাল জার্নির বাইরে। স্লো, লিরিক্যাল মুভমেন্টে ছবি গড়ায়। প্রতিটি ফ্রেমনির্মাণ এতো সরল, এতো প্রাঞ্জল যেন সিনেমার শরীরে প্রতিকবিতার টিপছাপ ! এক বিশাল বাড়িতে দাম্পত্যের মধ্যে বার্ধক্য, অভিমান, অসহায়তা মিশে যায়। কোনো ভ্যালু জাজমেন্ট নেই, সম্পর্কের দৈনন্দিনতায় সিনেমার পোশাক খুলে নেওয়া হয় একটু একটু করে। প্রতিটি 50 লেন্স, 85 লেন্স ঘটনাকে মাত্রাতীত করে দেয়। আর হ্যানেকে কোনোদিনই লিনিয়ারিটির তোয়াক্কা করেন না। তিনি জানেন ধারাবাহিকতা আখ্যানের কোন অংশে অনিবার্য, কোন অংশে অতিরিক্ত তা ঘটনার দাবিতেই নির্মাণ করতে হয়। তাই কন্টিনিউটি জার্ক আসে, অনায়াসে !

আসলে Amour দেখতে হবে দক্ষ পিপিং টমের মতো, এক নিরাসক্ত ভয়ারিজম নিয়ে। শুধু চোখ নয়, কান খাড়া করে ! দীর্ঘ করিডরে অশক্ত জর্জের হেঁটে যাওয়ার আবহে বেসিনে জল পড়ার শব্দ, প্রায়ান্ধকার দৃশ্যে পোশাকের খসখস আর ভারী নিঃশ্বাস, আট মিনিট ধরে স্ট্যাটিক ফ্রেমে কথোপকথনের মধ্যে অ্যাম্বিয়েন্স সাউন্ডের পরিবর্তন, সবই কিন্তু ছবির চরিত্র। প্রথম শটেই অ্যানের মৃতদেহ আবিষ্কারের মধ্যে যে রিল্যাকটেন্স আনেন পরিচালক, সেটাই কিন্তু এই ভালোবাসার শিরোনাম। তাই ওই রাতপোশাক ও টেবল ল্যাম্পের মধ্যে, চশমার খাপ ও কাঁপা হাতে ধরা ক্লাসিকের মধ্যে, বন্ধ দরজা ও শূন্য চেয়ারের মধ্যেই ওভারব্রিজ হয়ে থাকে ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং..... ভালোবাসা। মাইকেল হ্যানেকের Amour ।

হ্যানেকে একটা পৃথিবীর জন্ম দেন। সেখানে অস্তিত্বের ভেতর জলপড়ার শব্দ হয় অহরহ। বৃদ্ধ দম্পতির কথোপকথনের সময় স্ট্যাটিক ক্যামেরা স্লো প্যানে বিষয়ের ওপর একটা অথরিটি তৈরী করে। তাই যে সংলাপকে আপাত আটপৌরে মনে হয়, দর্শক বুঝতেও পারে না, কোথায় হ্যানেকে গল্পকে একটা বিপন্নতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন! এই বিপন্নতা 'পিয়ানো টিচারে' যেমন শরীরী বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে এসেছিলো, আবার 'হিডেন' ছবিতে প্রায় স্থির ফ্রেমে অনবরত ফোকাস শিফটিং এর মধ্যে দিয়ে যায়। হ্যানেকে এই নিরীক্ষামূলক রূপান্তরটা চালিয়ে যেতে পারেন বলেই তাঁর সব ছবিই এক একটা আলাদা গ্রহের মতো । সেখানে প্রথানুগতার অনুমোদন ছাড়াই মহত্বের শঙ্খধ্বনি বাজে। Amour এ এই মহৎ হয়ে ওঠার প্রবণতা কম, কিন্তু দৃশ্যের পিঠে দৃশ্য যখন প্রায় নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে এগোয়, তখন এক সমান্তরাল বিপন্নতা আমাদের জানায়, দুঃখের ওপর যে হাত রাখা থাকে, তার জন্ম এক নির্জন জলের গভীরে।

দম্পতির চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছেন জঁ লুই ট্রিনটিগাঁত ও ইম্যানুয়েল রিভা। মেয়ের চরিত্রে ইসাবেলা হুপে। ভাবা যায় ! কি সব দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রী ! যেন অভিনয়ের ওয়ার্কশপ ! কি সেন্স অফ ইকোনোমি, মৃদু আবেগের কি অব্যর্থ প্রয়োগ, হাসিকান্নার কি অনুপম সংকলন ! ছবির শেষ এক মর্মান্তিক পরিণতির মধ্যে...স্ট্রাকচারাল ও ফিজিক্যাল ভায়োলেন্সের মধ্যেই হ্যানেকে অন্য এক ভালোবাসাকে চিরজীবী করে যান। কেউ কেউ ডার্ক এন্ডিং বলতেই পারেন ! আমি বলবো এ এক অন্য ভালোবাসার আলো। এর ঝলকানিতে মানুষ অন্ধ হতে বাধ্য !

ছবিটি দেখেছিলাম কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথম বার, তারপর ব্যক্তিগতভাবে আরও বারকয়েক... এখন আমাজন প্রাইম ভিডিওতে ছবিটি দেখা যাচ্ছে। তাই সকলকেই বলা—

দেখুন প্লিজ, নাহলে নিজেকে ভালোবাসার ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করবেন !

(যদি দশজনও লেখাটি পড়ে ছবিটি দেখেন, একটা তথ্য দিয়ে রাখি তাঁদের জন্য.. 2012 সালে ছবিটি মুক্তি পায়.. বিশ্বের দশ বারোটি বড় ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবির পুরস্কার পায়.. তার মধ্যেই কান ফেস্টিভ্যালে Pam d Or ছিলো... তো, কান ফেস্টিভ্যাল এর নিয়ম ছিলো Pam d Or পাওয়া ছবিকে অন্য কোনো পুরস্কার দেওয়া যাবে না... সেবার ফেস্টিভ্যালে জুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মহান ইতালিয়ান পরিচালক নান্নি মোরেত্তি... তিনি ফেস্টিভ্যাল কমিটিকে নিয়মটা পাল্টাতে বলেন.... তাঁর ইচ্ছে ছিলো সেরা পরিচালক, স্ক্রিনপ্লে, অভিনেতা, অভিনেত্রী সব পুরস্কার এই ছবিকেই দেওয়া হোক... কমিটি রাজী হয়নি.. মোরেত্তি তার প্রতিবাদে অন্যান্য পুরস্কারে তাঁর কাস্টিং ভোট দেননি...

পরের বছর থেকে মোরেত্তি আর বোর্ডে ছিলেন না... কিন্তু পরে কমিটি তাদের নিয়ম পাল্টায়... মোরেত্তিও ফিরে এসেছিলেন তিন বছর পর... কমিটির অনুরোধে.....

ভালোবাসার জিৎ

স্মৃতি মধু সম

--ঝর্ণা চক্রবর্তী, ভারত

জীবনের মণিকোঠা থেকে কথা বলতে গেলে যে কত কথা মনে পড়ে কি বলব। মাস্কাটে তো আসা যাওয়া চলছে সেই ১৮ বছর ধরে। তাই তোমাদের সকলের নাম আজকাল মনে থাকে না, কিন্তু মুখ দেখলে সকলের কথা মনে পড়ে। বয়সের ভার একে বলে। অবাক হয়ে ভাবি সেই কোন কালে হাজারীবাগ শহরে ছেলেবেলা কাটিয়েছি। বলতে পার জন্ম থেকে আমার বিয়ে অবধি কাটিয়ে কলকাতায় এসেছি। বিরাশি বছরের জীবনে তো চল্লিশ বছর চাকরী করে কাটালাম। তাই সাহিত্য চর্চা কখন করব? জীবন সায়ানহে এসে মনে হয়, পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বয়স সীমার মধ্যে কাররই বসা বা আরাম করার সুযোগ হয় না।সংসার, ছেলেমেয়ে, সারাদিনের রান্নাঘর, ক্লান্তি জীবনকে নিংড়ে নেয়। আমারও তাই হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল কখন রিটায়ার করব। স্কুলের প্রধানের কাজ সেরে চলত ব্যাঙ্কের পরীক্ষা, UPSE, সেন্ট্রাল ও স্টেট গভরমেন্টের পরীক্ষার সেনটার হেডের কাজ, প্রায়ে সব সপ্তাহের শেষে। সত্যি সময় যে কখন বয়ে গেছে বোঝার সময় পায়েনি। যখন মনে হল, নাতনীকে নিয়ে সময় কাটাব, তখন ছেলে চলে এলো মাস্কাটে। ধীরে ধীরে মরুভূমির দেশ অনেক কাছের হয়ে গেল।

আমার বাবা ছিলেন হাজারীবাগ জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর উৎসাহে আমাদের পাঁচ বোন শিক্ষায়ে পারদর্শী হয়ে উঠলাম। আমার বাবা মহিলা শিক্ষার প্রসার করাতে, অনেকের রাগের কারণ হয়ে যান। তবুও আমার একদিদি লেডি ডাক্তার হলেন, আরেক দিদি আমার মত M.A. B.ED পাশ করে টচার হলেন। ১৯৫৭-১৯৬০-৬১ সালে বিহারে পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে মেয়েরা এত শিক্ষিত হতেন কম। মনে পড়ে তখন সাইকেল চালিয়ে পাটনাতে পিজি বা হস্টেল থেকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যেতাম।তখন কেউ না কেউ দোপাট্টা টেনেছিল। বিহার তো, এ চলতেই থাকত। তবে কক্ষনো ভয় পাই নি। মনটা মাঝে মাঝে হুহু করে- স্মৃতির ভারে। আনন্দ-দুঃখ সব কিছুরই স্মৃতি মনে পড়ে। বেশী করে ছেলেবেলার কথা মনে ভিড় করে আসে। চোখ বন্ধ করলেই হাজারীবাগের ছোটো কথা মনে পড়ে। মা মারা যাবার পর আর যাওয়া হয়েনি। আমাদের সেই দালান দেওয়া বাড়ি, উঠান।
মা, জেঠিমারা রান্না ঘরে কাজ করছেন, গোয়াল ঘর। কত গাছ। গরমে উঠানে ঘুমনো, প্রচণ্ড শীতে লেপের তলায় ঘুমনো সে যেন ছিল সোনার দিনগুলি।বাড়ীর পিছনে ছিল মিঠা তালাও- মিঠে জলের লেক, যেখানে বাঘ জল খেতে আসতো।

এরকম হয়েছে বেশ কয়েক বার, যে বাঘ গোয়াল ঘরে এসেছে, উঠানে শব্দ আসায়ে আমাদের কাকা আমাদের হই হই করে ডেকে ঘুম থেকে তুলে, ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও অন্ধকারে গা ডাকা দিয়েছিলেন।
হাজারীবাগ নামটা মিষ্টি। ছোটো শহরে এক সময় হাজার বাগান ছিল। কি সুন্দর ফুল, কি সুন্দর সবুজে ঢাকা গাছ, সারাদিন পাখির ডাক-সন্ধ্যেতে শিয়ালের ডাক, মাঝে মধ্যে বাঘের ডাক। সে এক রোমাঞ্চ। এখনতো বাচ্চারা ঘরে টিভিতে রিমোটে বোতাম টিপে খেলে রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ায়ে, আমাদের সময় হাতে নাতে ছিল জীবন-মরনের চাবিকাঠি। সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে বেশী বের হবার হুকুম ছিল না। বলা যায়ে না, কখন ক্যানারি পাহাড় থেকে শিয়ালের দল বা বাঘ এসে পড়বে!
বাড়ীতে প্রায়ে আমরা জাঠতুতো - কাকাতুতো মিলে প্রায়ে ২০ ভাইবোন ছিলাম আমাদের হইচই কম ছিল না, গম গম করত সারা বাড়ী।

৬০এর দশকে রাঁচিতে ওয়মেন কলেজ প্রথম চাকরী নিয়ে যাই। পরে ধানবাদে গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করি। রাঁচিযে কি সুন্দর শহর ছিল, কি বলব।ছোটোনাগপুর মালভূমি সবদিকে সুন্দর ছিল। আমার কলকাতা আসা বিবাহসূত্রে। অধ্যাপনা ছেড়ে আসতে মন ভেঙ্গে গেছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি উদার হওয়ায়ে বাড়ীর কাছে গভেরমেন্ট স্কুলে চাকরি শুরু করি।
দুবছর আগে আমার ছেলে ও বউমা কে জানাই আমার মনের কথা যে- ছেলেবেলার হাজারীবাগে একটু ঘুরে আসব। যদিও শরীর সায়ে দেয়েনা। তবু চেষ্টা করি।আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা আমার কথা রাখল। ২০১৯এর ডিসেম্বর মাসে মা ও ছেলে মিলে আমারা চার দিনের জন্য হাজারীবাগ ও রাঁচি বেড়াতে গেলাম।বহুদিন বাদে ছেলের সাথে রেলগাড়িতে চড়ে যেতে খুব আনন্দ পেলাম।একসময় আমার সাথে হাত ধরে ছেলে গেছিল, আজ আমি ছেলের হাত ধরে। ধীরে ধীরে সম্পর্ক পরস্পর বদলাতে থাকে।

আমার নিজের শহর আমার কাছে অপরিচিত। কিছু চিনতে পারছি না, মেলাতে পারছি না আমার দেখা হাজারীবাগের সাথে। কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সময়ের সাথে আমার মন এগিয়ে চলেনি । আমার মন তো সেই ছেলেবেলাতে আটকে গেছে।সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমাদের দালান দেওয়া বাড়ী আজও আছে, কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে। তবু কড়া নাড়িয়ে গৃহকর্তাকে ডাকলাম।যদিও জানিয়ে আসীনই, তবুও ভালভাবে আপ্যায়ন করলেন। একটু ঘুরে দেখলাম, বহু নিদর্শন মুছে গেছে, কিন্তু কিছু আছে।দেয়াল ছুঁলাম।মনে হল, পিতৃপুরুষের ভিটা তো, হৃদয়ের গভীরে এক দাগ কাটল। মিঠা তালাও দেখলাম, এখন সে ছোটো লেক।ক্যানারি পাহাড়ে গেলাম। মনে হল, ছুটে ওপরে দৌড়ে যাই, কিন্তু পা তো সাধ দিতে পাড়ল না, তাই ছেলে পাহাড়ে উঠল। মনে পড়ল আমার বন্ধুদের সাথে ক্যানারি পাহাড়ে আসার কথা। কত হাসি, মজার ছিল দিনগুলো। পথে গাড়ী থামিয়ে সেন্ট্রাল জেল ও রেফরমেট্রি দেখলাম। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সেন্ট্রাল জেল আটক করে রাখা হত। তাই তাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে চললাম হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক। কি সুরেলা পাখির ডাক, সবুজ গাছপালা। একদল বাঁদর দেখে কি হাসি পেল।বন্ধুরা মিলে ছেলেবেলাতে এদেরকে কত ভেংচি কেটেছি, মনে আসতে নিজেই হাসলাম। তবে আমাদের গাড়ী দেখে তারা যে খুব খুশী হয়েনি বোঝা গেল। একদম ভিতরে গিয়ে লেকের ধারে রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেলাম।কত স্মৃতি মনে পড়ে গেল, আমার বিয়ের পর নতুন জামাই কে নিয়ে আমার পরিবারের কিছু আত্মীয় একসাথে এসেছিলাম। সে তো কত যুগ আগে। ইমশোনাল হয়ে যাচ্ছিলাম।

এরপর এলাম পদ্মারাজার রাজপ্রাসাদে। রক্ষণাবেক্ষণের ওভাবে মলিন হয়েছে এঁর সৌন্দর্য। শুনলাম এই প্রাসাদ ও রাজার জমিতে মেডিকাল কলেজ হবে।ভাল লাগল শুনে, তবে এই উন্নতি আরও চার দশক আগে হওয়া উচিত ছিল। পথে পড়ল আমার কলেজ। সেন্ট কলম্বাস কলেজ। ১৯৫৮ সালে গ্রাজুয়েশন করেছিলাম। পুরানো দিনের প্রফেসর আর নেই, তবু নতুন প্রফেসরদের সাথে আলাপ হল। তারা এত আদর জানালেন, তাদের পুরানো কলেজের ছাত্রীকে দেখে। সারাদিনের বেড়ানো ছেলের হাত ধরে, তাও নিজের ছেলেবেলার জগতে, এ আমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ।
যাই হোক, "দুর্গা দুর্গা" বলে বর্তমানের রাজ্য ঝারখন্ডেরর রাজধানী রাঁচির উদ্দেশ্যে রয়না হলাম। শহরে ডোকার মুখে ঝর ঝর ঝর ঝর্ণা দেখতে চলে এলাম। ভারত বিখ্যাত হুড্রু ফলস। হুড্রু প্রকৃতির নিয়মে বছরের পর বছর সমহিমায়ে সশব্দে বয়ে চলেছে। সুবর্ণরেখা নদীতে এই ঝর্ণা, যে অসাধারণ রূপ নেয় বর্ষাতে।মনে পরে রাঁচি কলেজে পড়ানোর সময় থেকে এখানে এসেছিলাম ছাত্রীদের নিয়ে এক্সকারসানে। রাঁচিতে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাঁচি ওয়মেন কলেজ দেখা। কলেজের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মনে হল, চোখের সামনে দিয়ে ১৯৬২ সালের আমি যেন গটগট করে নতুন অধ্যাপিকা প্রবেশ করছি। কি সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনা এ বয়েসে সারা শরীরে বয়ে চলল। স্মৃতি বিজড়িত কলেজ দেখে, নতুন প্রজন্ম কে আগে এগিয়ে যেতে দেখে মন ভরে গেল।তবে চমকে উঠেছিলাম, রাঁচির ট্যাগর হিল দেখে। সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেই মালভূমি বদলে গেছে। সে টিলা কোথায়? স্থানীয় লোকেরা টাগর হিল বুঝতে পারছে না। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম, কিন্তু শে দেখে আমার দুঃখ হোল।শুধু বাড়ী বাড়ী আর বাড়ী; অনেক দু রে একটা উঁচু জায়গাতে রবি ঠাকুরের বাড়ী লক্ষ করা গেল।

প্রাণভরে আশীর্বাদ জানালাম আমার ছেলে ও বউমাকে এবং মেয়ে জামাইকে ।অনেক স্নেহের পাত্র পাত্রী তারা।ঈশ্বর কে প্রণাম জানালাম এই সুযোগ করে দেবার জন্য।

মাস্কাটে দুবছর অতীমারীতে আটকে আছি।২০১৯ হাজারীবাগ ভ্রমণ শেষে মাস্কাটে ২০২০ জানুয়ারিতে এসে সেই যে "করনা" ভয় শুরু হল, জীবনও গেল উল্টে। করনার ভাক্সিনেসন বেরিয়ে মানুষের জীবন শুদ্ধ করে প্রাণ বাঁচিয়ে দিক। পৃথিবী সুন্দর হক। সকলে ভাল থেক, আশীর্বাদ রইল।তবে মাস্কাটের বন্ধু আলো দির সাথে মিষ্টি স্মৃতি আমার কাছে চিরমধুর।

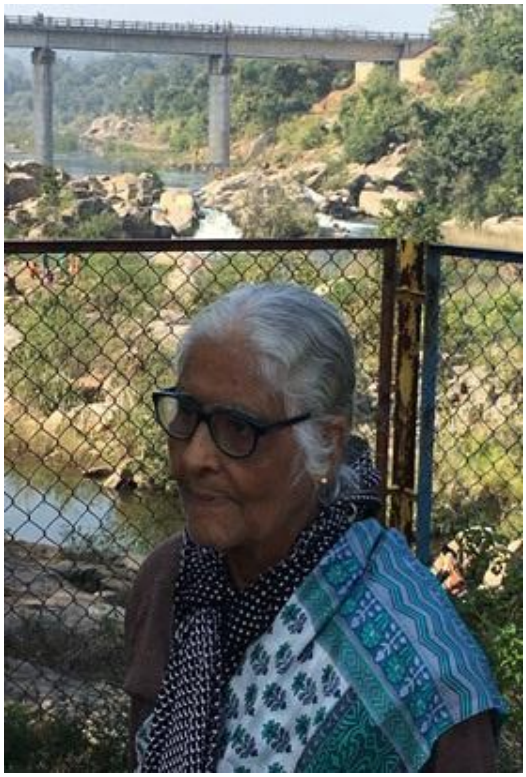

ঝর্ণা চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

মানুষ

--নম্রতা চক্রবর্তী, কানাডা

আমার কলকাতায় জন্ম হলেও আরব সাগরের ধারে উষ্ম মরুভূমির মাঝে ছেলেবেলা কেটেছে। ভারতীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পর বরফের দেশ কানাডার হেলীফ্যাকস শহরে গ্র্যাজুয়েশন শেষে চাকুরী সূত্রে এই সুন্দর শহরে বসবাস শুরু করলাম। ধীরে ধীরে আটলান্টিক সমুদ্র কাছের হতে গেল। বিশ্ব বিদ্যালয় পড়াকালীন মনে মনে বুঝতে পারি শুধু শারীরিক নয় মানসিক সুস্থতার চাহিদা কত জরুরী। সব কথা যেমন উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সব চিন্তা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমি নতুন ভাবে, নতুন প্রথায় নতুন প্রযুক্তির সাথে হাত মিলিয়ে ADHD বিষয়ে মনের ভাল থাকার কথা সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ।

বাংলা ভাষায় আমার দক্ষতা কম হলেও ইংরেজীতে গল্প কবিতা লিখে আমার সময় কাটে।
আশা রাখি আমার এই মন ভালো রাখার ব্লগ ও শিক্ষনীয় Tik Tok ভিডিও গুলো আপনাদের ভালো লাগবে।Tik Tok প্ল্যাটফর্মের সাহায্য নিলাম কারণ নতুন প্রজন্ম Tik Tok এ জড়িয়ে আছে।

HUMAN

A whistling wind blew across the sea
Which mirrored a silvery moon
Though dark as ever a night could be
It sang with unaided tune

The clouds above played games, up high
Promising to break with furious rain
But heard our prayers and drowned in the sky
To reveal a dark and starry terrain

A shooting star fell out from heaven
Disappeared as fast as it came
It fell behind the hills, so unshaven
And left the night to remain the same
The soothing voices of palm tree leaves
Whispered to each other in a rustling hushed tone
As they danced and moved to the cool breeze
Which made sure no tree was left alone
When the waves rolled in and licked my toes
A peace, overwhelming, swept through me
And washed me away of all my woes
Letting my mind wander more free

Nearby wild horses galloped past
Creating a ruckus on the seashore sand
They were here for a moment but gone pretty fast
Never stopped to see a night so grand
They didn't hear the wind sing
They didn't glance at the glimmering sea
They didn't wait to watch what the night would bring
It felt good to be human; it felt good to be me

Namrata Chakraborty
Vice-Curator, Global Shapers Halifax Hub
www.namisayshello.com
Tiktok | Instagram | LinkedIn

বেঁচে থাকার গান

--জয়তী মুখোপাধ্যায়, ভারত

এর চেয়ে আরও ছিল কঠিন সময়ও,
কতবার মৃত্যুকে পাঞ্জায় লড়ে
ফিরে যেতে বলেছি তো মহামারী শেষে
সে সকলই লেখা আছে শিলার আকরে।

যতবার বইয়েছে বহ্নি দু' চোখে
স্রোতধারা হতে চেয়ে ছুটে আসে বায়ু;
খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে আঁচলে ভরে রাখি
আমাদের চিরজীবী এক ফোঁটা আয়ু।

আমাদের বেঁচে থাকা স্বতঃস্ফূরণে
বেঁচে নেওয়া ঘন তিমিরান্ধ সময়ে;
ভীষণ দ্রোহের কালে, ভাঙাচোরা মনে
বেয়েছি জীবনতরী ঝঞ্ঝা-প্রলয়ে।

আমাদের দেখা হোক সে কালান্তরে
দেখা হোক বিমোহিত অক্ষয় পলে,
জানি দেখা হবে পারাপার পথ ধরে
ঊষালগন কিরণে মনোসহস্রদলে।

চালাও পানসি মাঝদরিয়া

--গৌতম রায়চৌধুরী, আমেরিকা

যে ভাবে এলে ঠিক নয় তা
আমার প্রস্তুতি দরকার ছিল
চিঠি লেখেনা কেউ আজ
ভাসাভাসা সমাচার ভেসে
আসে আজ দেশে।

এভাবে আসতে নেই
বজ্রপাত অতীব প্রয়োজনীয়
লক্ষণরেখা টানা
সিঁথিতে সিন্দুরও তাই
প্রয়োজন দামাল হাওয়া
নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
মাঠে মাঠে বনে বনে
সেই কথা ঘোরে ফেরে জানান দিয়ে।

কি কথা? ভুলেছো আজ ?
চড়ায় শুয়ে শুধু না দেখা ঢেউ গোনা
বোঝোনা মাটি ফেটে ঢেলা হয়
গাছের ডাল থেকে তির
হরিনের অন্ত্রে ছিলা জানোনা ?

তবু জঙ্গল ডাকে ও ধানুকী
টিলা থেকে দেখি
ডাকলেই হল? ইয়ার্কি নাকি ?

চলে আসি যদি
নদী ফেলে এ শহরে
টিলা থেকে নেমে
বনে আগুন জ্বালিয়ে
যদি আসি
এই গাঙে ফের যদি ভাসি
নেবেনা কেউ
না মাছ না মাছরাঙা
তবু আকুলতায় পানসি ভাসে।

আসে সে না জানিয়ে
স্তব্ধ কূয়ার জল
তার প্রতিচ্ছবি ,চাঁদেরও
ধরে নাও এই ছবিতেই
দিলাম ফেরৎ সব ঋণ
ধারকরা টাকা আর যা ছিল বাকি।

অতঃপর এক ফুঁয়ে নিভিয়ে বাতি
পানসি ভাসে জ্যোৎস্নায় একাকী।

'বাঁচবো' - ভরসার এক নাম

--ডাঃ ধীরেশ কুমার চৌধুরী, সভাপতি, 'বাঁচবো', ভারত

সকলকে ভালো রেখে নিজেদের ভালো ভাবে বাঁচবা র তাগিদ থেকেই ১৯৯৫ সালে কিছু কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গড়ে ওঠা সংগঠন 'বাঁচবো'। আজ তার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের বহু জায়গায়। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের যাত্রা পথে দেশ বিদেশের বহু মানুষ ও সংগঠনের সান্নিধ্য ও সহযোগিতাকে পাথেয় করে 'বাঁচবো' আজ পশ্চিমবঙ্গের একটি অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।
প্রত্যন্ত সুন্দরবনে প্রান্তিক শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে 'বিকশিত' নামে দ্বিতল প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুল 'বাঁচবো' র অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। বর্তমানে এই স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করছে ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী। যাদের অনেকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। সুন্দরবন ও কলকাতার ৯ জন শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে চলছে এই স্কুল, যাদের মধ্যে রয়েছেন গান ও আঁকার শিক্ষিকাও। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রেও পারদর্শী করে এই ছাত্রছাত্রীদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে 'বাঁচবো'। কলকাতার বিভিন্ন নামী প্রেক্ষাগৃহে এই ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশন উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে ইউনিসেফ, মার্কিন কনস্যুলেট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। ইউরোপের শিশুদের সাথেও একত্রে অনুষ্ঠান করেছে এই ছাত্রছাত্রীরা। করোনা র এই কঠিন সময়েও হোয়াটস অ্যাপ এর সাহায্যে স্কুল এর পঠন পাঠন ধারাবাহিক ভাবে চলেছে যা সত্যিকারের উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। 'স্নেহা' উদ্যোগের মাধ্যমে বহু শুভানুধ্যায়ী এই ছাত্রছাত্রীদের স্পনসর করে আমাদের এই মহৎ প্রয়াসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।
'বাঁচবো' র অন্যতম ইউনিট 'বাঁচবো স্কুল অফ হিউম্যান স্কিল ডেভলপমেন্ট' এর হাত ধরে সার্টিফাইড নার্সিং অ্যাসিস্টেন্ট এর প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় যেমন নার্সিং হোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হসপিস ও হোম কেয়ারে কাজ করে আত্মমর্যাদার সাথে স্বনির্ভর হয়েছে কলকাতা, সুন্দরবন ও জঙ্গল মহলের প্রচুর যুবতী ও যুবক। 'বাড়িয়ে দাও তোমার হাত' প্রয়াসেও বহু মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছেন এই যুবক যুবতীদের। বর্তমানে নবম ব্যাচ চলছে এই প্রশিক্ষণের।
পরিস্থিতিগত বিভিন্ন কারণে বর্তমানে প্রবীণ মানুষদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অনিশ্চয়তা নিয়ে সকলেই চিন্তিত। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ২০০৭ সালে 'বাঁচবো হিলিং টাচ্' প্রকল্প শুরু করে 'বাঁচবো'। পূর্ব ভারতের এটিই প্রথম ২৪ x ৭ প্রবীণদের গৃহ ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। ১০ জন চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতা স্থিত ৫৫০ রও বেশি প্রবীণ মানুষকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিরোধ মূলক ও দিনরাত্রি আপদকালীন চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছে 'বাঁচবো'। এছাড়াও রয়েছে নার্সিং, কেয়ার গিভার, ফিজিওথেরাপি, কাউন্সেলিং, অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন অ্যাডেড পরিষেবা। প্রবীণদের পরিষেবায় পথিকৃৎ হিসেবে 'বাঁচবো' র এই কার্যক্রম দেশে বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও পত্র পত্রিকা ও মিডিয়া দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য সহ বহু প্রবাসীদের বাবা মা এই পরিষেবার সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে। এরই পাশাপাশি সুন্দরবনের প্রান্তিক প্রবীণদের জন্য বাঁচবো গড়ে তুলেছে 'জেরিয়াট্রিক আউট পেশেন্ট ক্লিনিক'। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে এবং বিনামূল্যে ওষুধ ও বিভিন্ন পরীক্ষা র সুযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে উপকৃত হয়েছেন বহু প্রবীণ মানুষ।
এসবের সাথেই সারা বছর ধরেই শিশু, যুবক-যুবতী, প্রবীণদের নিয়ে 'বাঁচবো' র পরিচালনায় আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষত আয়লা, আমফান, যশ প্রভৃতি ঝড়ের পর 'বাঁচবো' র উদ্যোগে সংগঠিত ত্রাণ ও স্বাস্থ্য শিবির বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরুস্কারের পাশাপাশি 'বাঁচবো' সংগঠনগত ভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নথিভুক্ত ও স্বীকৃত যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - রাজ্য সরকারের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনে নথিভুক্ত, ভারত সরকারের নীতি আয়োগ এর এনজিও দর্পণ, আয়করের ৮০জি ও ১২এ ধারায় নথিভুক্ত, এফ সি আর এ নথিভুক্ত, সি এস আর নথিভুক্ত, উদ্যোগ আধার নথিভুক্ত এবং আই এস ও ৯০০১:২০১৫ নথিভুক্ত।

শিশু থেকে প্রবীণ সমাজের সর্বস্তরের সববয়সী মানুষের ভরসার আজ এক নাম 'বাঁচবো'। চলার পথে বরাবরের মতনই আগামীদিনেও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় ধন্য হবে 'বাঁচবো' এই বিষয়ে নিশ্চিত।

আমাদের কর্মধারা সম্পর্কে বিশদ জানতে -
www.banchbongo.org
www.banchbohealingtouch.org
www.facebook.com/BANCHBO
www.facebook.com/BSHSD
banchbo@gmail.com

'বঙ্গ সৃজনী' র সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ভালো থাকবেন আর ভালো রাখবেন।

Help Maa Durga to reach the Earth

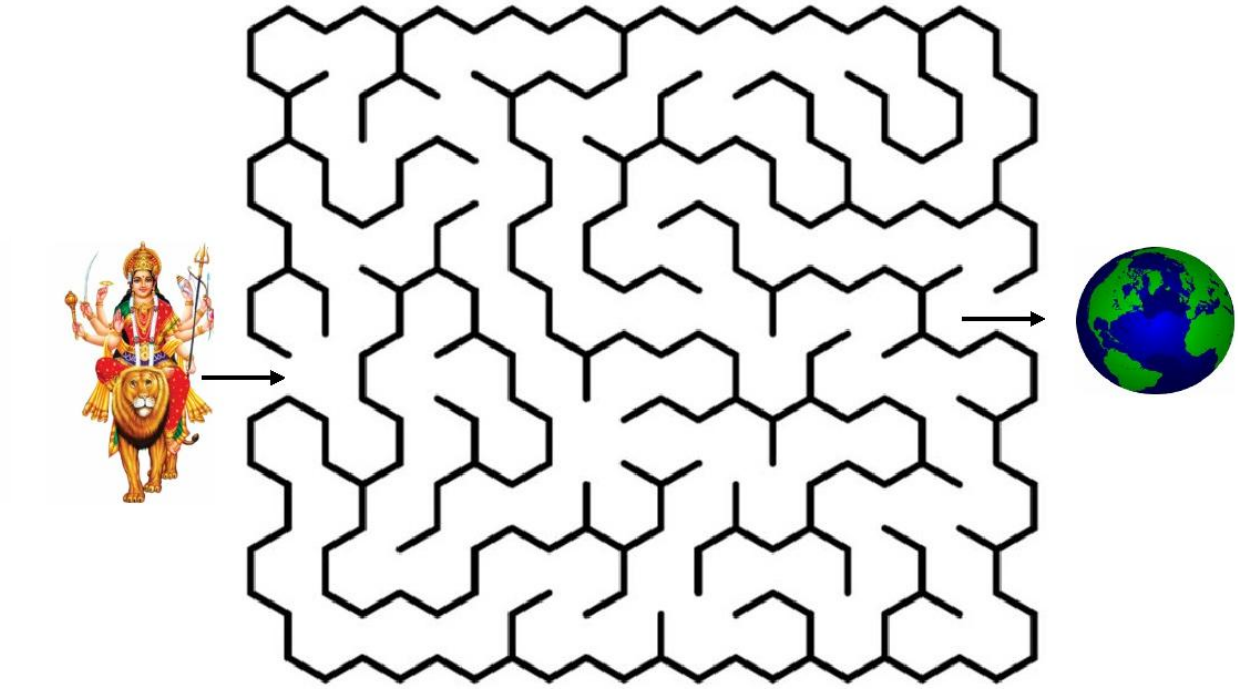

Help Bal Ganesha to revolve around Maa Durga

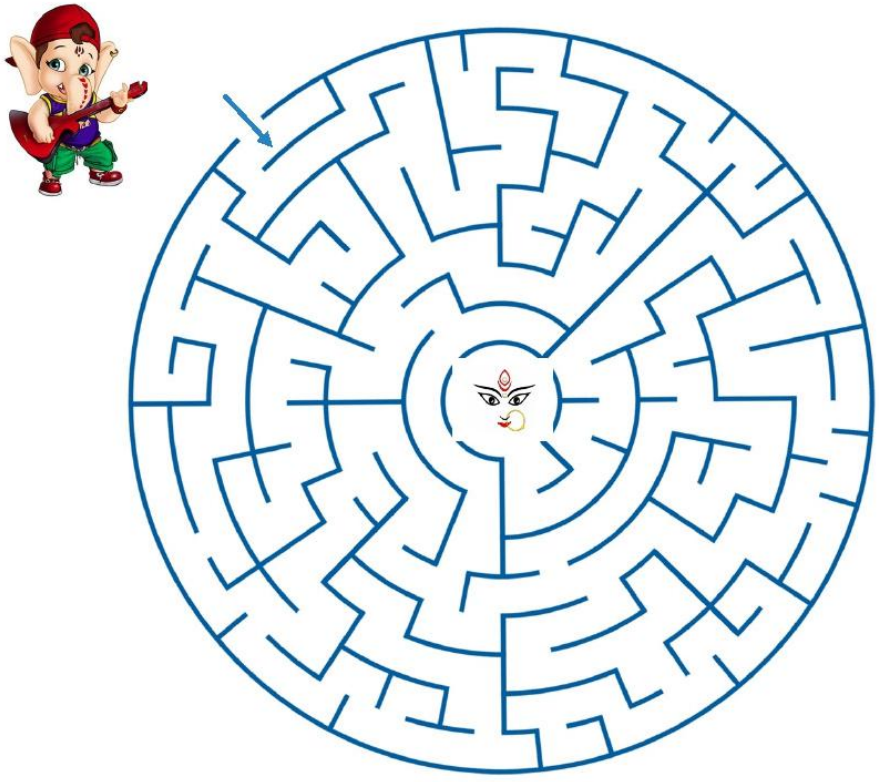

Crossword Puzzle

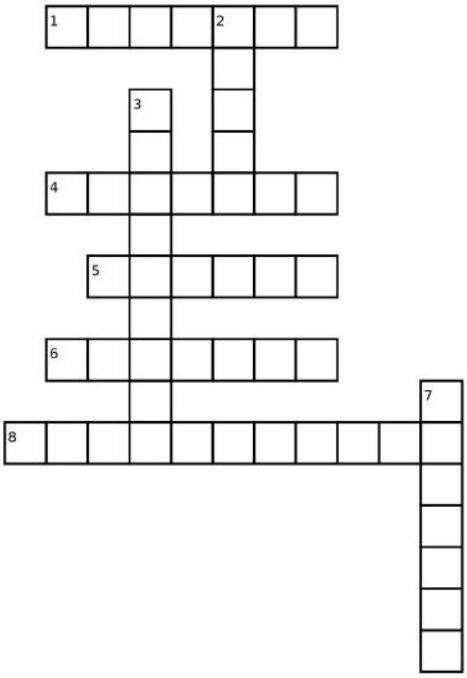

Down:

2. Who is Maa Durga's Husband?
3. Which ancient river (In Vedic Era) is named after one of Durga's daughter?
7. Who is goddess of wealth, fortune, power, health and prosperity?

Across:

1. Which god is known as elephant headed god?
4. Who is daughter of Himavan & Mainavati?
5. Durga puja is celebrated in which month?
6. Transport of Lord Kartikeya?
8. Maa Durga killed which demon?

Bong Srijani
Let Bong spread its Aura

শারদীয়া